Presented by
Presh Ch. Chatterji

স্বর্গগতা

সেজ পিসিমার শ্রীচরণ উদ্দেশে।

উপহার

সূচী।
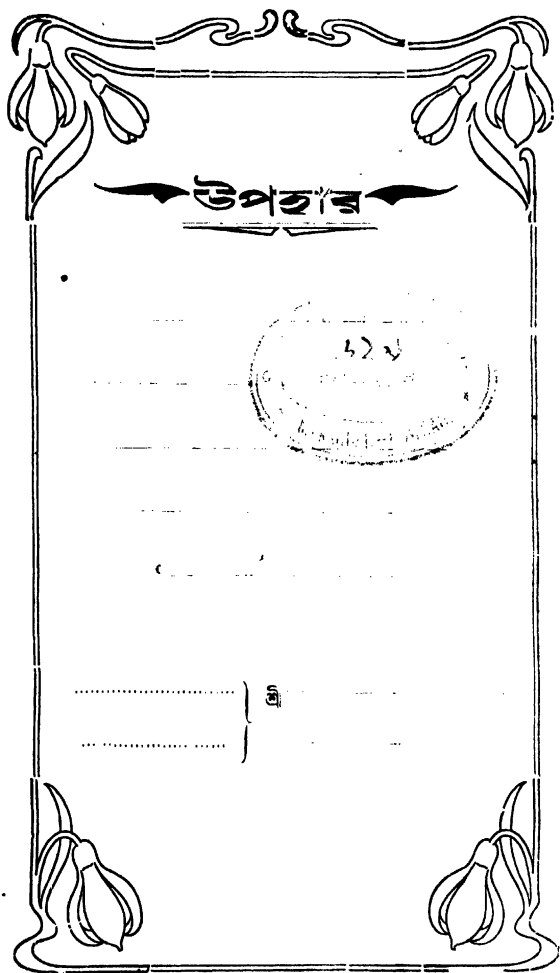
সেপাই-ঝোরা	...	...	১
দীক্ষা	...	...	৪৮
বার-বেলা	...	...	৬১
লেণ্ডু-মামা	...	...	৯২
ব্যথা	...	...	১১৪

সেপাই-ঝোরা

ঝরণা! ঝর ঝর শব্দে ঝরে পড়ত অবিশ্রান্ত—কি ভয়ানক উন্মত্ত ভাব তার। সাদা, একেবারে সাদা রাশি রাশি জল আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ত যেন পাগলিনী বিধবার মূর্ত্তি তার। এই ঝরণার ধারেই বেড়াতে আসা ছিল আমাদের কাজ, প্রত্যহই একবার ক'রে বেড়িয়ে যাওয়া চাই এতটা পথ হেঁটে।

ক'টাদিন কিন্তু বেড়ান হয়নি; যেমন বৃষ্টি, তেমনি বিদ্যুতের খেলা; ঘরের বাইরে যাবার উপায়টাও ছিল না। তাই ঘরে বসেই মেঘ-বিদ্যুতের হাসিখেলায় আর ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিতে মাতোয়ারা হ'য়ে আজ ক'য় দিন পরে একটু আলোর দেখা পাওয়া গেল। চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে মনটাও আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ল। সমস্ত দুপুরটা কোন রকম ক'রে কাটিয়ে দিয়ে বিকাল হ'তেই বেরিয়ে পড়লুম, দলের সকলেরই বড় স্ফুর্ত্তি সে দিন। সোজা ঝরণাটার দিকে চল্‌তে লাগলুম ক'জনেই। সেই মস্ত বড় পাথরটা ঝরণার মাঝখানে, সেইটার ওপর বসে আন্‌মনে স্বভাবের বিরাট সৃষ্টির

পানে চেয়ে থাকাই ছিল কাজ আমাদের। আর সম্মুখেই সেই অনন্ত শৈলশ্রেণী, দৃষ্টির আয়ত্ত অতিক্রম ক'রে দূরে অতিদূরে সেই রজতধবল, তুষারমণ্ডিত শুভ্র শিখরমালা; কি রকম ক'রে যে অত সময় কেটে যেত এই দূরের পানে চেয়ে তা জানিনা।

বেলা পড়ে এল তখন যখন ঝরণার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি; ঝরণার পানে চেয়ে দেখি—সূর্য্যের দিনান্তে ফিরে চাওয়ার সে ক্ষণিক চাহনি একবার পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে আর একবার ঝরণার সমস্ত রূপালি জলকে সোনার আভায় রঙিয়ে দিয়ে সবুজ গিরিশ্রেণীর পাছে মিলিয়ে গেল। শেষ রঙিন্ রেখাটুকু সূর্য্যের ধরার অনন্ত অঙ্গ থেকে মুছে যাওয়ার পরই আঁধারের স্নিগ্ধ স্পর্শ ঝরণার সোনার জলকে মলিন ক'রে দিলে; অমনি ঘুমন্ত তারকা-রাশি আকাশের বুকে জেগে উঠ্‌ল; নীলিমার উদ্‌ভ্রান্ত চাহনির পানে চেয়ে চেয়ে ঝরণা ঝর্ ঝর্ শব্দে বিক্ষিপ্তভাবে শৈলতলে লুটিয়ে পড়ল তার শিথিল বক্ষ এলিয়ে দিয়ে। তারই পানে চেয়ে ছিলুম আমরাও—এমনি ক'রে সে দিন পর্য্যন্ত চেয়েছিল ঝরণারই পানে আর একজন সে আজ নেই। সে আমাদের কেন, তার বড় আদরের ধন বড় ভালবাসার জিনিষ এই নীল সবুজের মাঝে বহে যাওয়া ঝরণাটাকেও ছেড়ে গেছে জন্মের মত এ দুনিয়া থেকে। তারই কথা মনে প'ড়ে আজ মনটা বেদনায় ভ'রে উঠল। আনমনে চেয়ে-দেখি, যে গোয়ালাটা দুধ দিত আমাদের সে সেই দুধের টিন্‌গুলো পিঠে ঝুলিয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে এই দিকেই আস্‌ছে।

দলবাহাদুর দুধ দিত, খুব বুড়ো সে কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সেও

তার পরিশ্রমে বিরক্তি নেই। সমস্ত দিনের পর একবার ক'রে তাকে প্রায় প্রতিদিনই দেখতে পাওয়া যেত এই ঝোরার কাছটায়। দলবাহাদুর তার দুধের টিন দুটো পিঠ থেকে নামিয়ে রেখে আঁচলা ক'রে জল খেয়ে নিলে ঝরণার ফুলেওঠা বুক থেকে —তারপর এসে পাথরটার পাশে বস্‌ল—চুপটী ক'রেই সে বসেছিল রোজ্‌কার মত।

মনটা একটু চাঙ্গা ক'রে নিয়ে তাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলুম—

"দলবাহাদুর, আচ্ছা এই ঝোরাটার নাম 'সেপাই ঝোরা' কেন বল্‌তে পার?"

দলবাহাদুর অনেকক্ষণ মুখের দিকে আমাদের চেয়ে থেকে পাহাড়ী ভাষায় বল্লে—

"সে বহুৎ কথা বাবু, লোকে ত গল্প ক'রে; সে আর শুনে কি হ'বে?

একটা সূত্র পাওয়া গেল—অনেক জেদ করার পর সে বল্‌তে আরম্ভ করলে সেদিন সেই সেপাই ঝোরার কাহিনী।

বাড়ী ফিরে এলুম, বেশ রাত্রি হ'য়ে গেল। সে গল্পের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে মনে হ'ল দলবাহাদুরের মত প্রাণের ব্যথা আর চোখের জলের মধ্য দিয়ে না বল্‌তে পারলে সে কাহিনীর প্রাণ পাওয়া যায় না। ঠিক ঝোরার উচ্ছ্বাসের মত সে বলে যাওয়ার স্রোত দুর্ব্বার। এই ঝরণার ধারে গ'ড়ে তোলা অচ্ছেদ্য প্রেম সেপাই সামসেরের, আর অসীম প্রেমের পথাভিসারিণী মসিনার জীবন-গতি—সবটাই তাদের এই ঝরণার বুকে নিহিত। ঝরণার

সেপাই-ঝোরা

প্রত্যেক জলবিন্দু তাদেরই স্মৃতিটুকু নিয়ে উচ্ছ্বাসভরে ছুটে চলেছে। সেপাইএর বাঁশীর সুর ঝোরার ঝ'রে পড়ার ঝুর ঝুর শব্দে মিশান, সে সুরের রেশ, সে গানের বিহ্বল মূর্চ্ছনা এখনও কানে ভেসে আসে; তৃষ্ণার্ত্ত আঁজল ভ'রে এই ঝরণার জল পান করে।

*　　　*　　　*　　　*

একটা আপনহারা পাগল ভাল ক'রে গায়ের শালখানা জড়িয়ে নিয়ে কতগুলো উৎসুক শ্রবণকে আর তাদের স্থির দৃষ্টিকে আপনার পানে রেখে ব'লে গেল—

১

সে কত কালের কথা; গল্প শুধু শুনে এসেছি। তখনও দিন কাটছিল, এমনি ভাবেই। কত দিনই কেটে গেল এমনি ক'রে। নূতন সবুজ ঘাসের উপর সাদা গরুটীকে ছেড়ে দিয়ে সামসের একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল বনের পথে। এধার ওধার চ'রে বেড়াতে বেড়াতে গরুটীও যখন বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, তখন সামসেরের কাঠ কাটা হ'য়ে গেছে—সকালের রোদ মেঘের আড়াল থেকে সরে গেছে—অন্ধকারের নিদারুণ আবরণে ঢাকা প'ড়ে। বনে আর সাড়া শব্দ নেই যখন—কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁঝির ঝিল্লি রব, শুক্নো পাতার মুখর মর্ম্মর, আর ঝরণার অনাবিল ঝর্ ঝর্ শব্দ শুধু—তখন বড় একা একা ঠেক্‌তে লাগ্‌ল সামসেরের। উদাস প্রাণে সে তার ছোট বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিলে—বড় মধুর বড় শান্ত ফুৎকার সে। বাঁশীর সুর তার সেই বনের দিগ্‌দিগন্তে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল। ঝিঁঝিঁর ঝিনি ঝিনি আর পাতার সর্ সর্ শব্দে মিশে গেল সে সুর, ঝরণার ঝরে পড়া সাদা ফেনময় জলোচ্ছ্বাসে আবেগভরে খেলে গেল সে সুর।

একটা পাহাড়ী সুর বাজাচ্ছিল সামসের। গান কি বোঝা

গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানীর মত সে পাহাড়ী সুর সেই মেঘলা দিনে বাদ্‌লার হাওয়ায় মিশে কুয়াশার আশেপাশে স্বপ্নের মত সেই বনের চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল। আজ তার কত পুরাণ কথা মনে পড়তে লাগ্‌ল। সেই পশ্চিমদিকে যেখানে মেঘের কোলে তখনও সূর্য্যের ম্লান আলো ঝিকিমিকি জ্বল্‌ছে, যেখানে কাল মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে, সেখানে সেই অন্ধকার আকাশের নীচে—মনে পড়ে গেল—পাহাড়ের গায়ে তাদের সেই বাড়ীটি। বাড়ীর সামনের সেই জায়গাটীতে চাঁদের আলোয় সে তার মায়ের কাছে বসে খেলা করত। কি সুন্দরই ছিল, সে বাড়ীর সেই উঠানটী! চাঁদের আলো আর তার মায়ের সেই হাসি মুখ—কত সুন্দর! সবুজ ঘাসের উপর পাহাড়ের ঢালু গায়ে তাদের সেই কাল বাছুরটী চরে বেড়াত কাল কাল তার চোখ দুটী নিয়ে। কিন্তু আজ সে সব কই? সে ছোট বাড়ীটি এখনও আছে তাদের, কিন্তু বাড়ীর সে শ্রী কই? তার সে মা কই? তার মা নেই, সামসের মাতৃহীন। তার বাপের কাছেই শৈশব থেকে মানুষ।

সে শাল-বনের চেহারাও যেন বদ্‌লে গেছে। উঠানের 'পীচ' আর 'আলুবখ্‌রা' গাছগুলোর ঝোপেঝাপে কত রঙিন পাখী উড়ে বস্‌ত, এখনও বসে কিন্তু যেন সবার মাঝেই একটা বিষাদের ছায়া! ফুটে থাক্‌ত পাহাড়ের গায়ে কত ফুল—ফুলের গোছা—ফুল গাছের সারি--কি সুন্দর রং! কিন্তু সামসেরের চোখে আজ তাও শোভাহীন! সজল নয়নে সামসের মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে তার

বাঁশের বাঁশীতে সেই পাহাড়ী 'গজল্' বাজাতে লাগ্‌ল ;—বাঁশীর করুণ সুর বন থেকে কেঁপে কেঁপে, কেঁদে কেঁদে ঝরণার সাথে আছাড় খেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। কত গাছগাছার পাশ কাটিয়ে কত বন উপবন পার হ'য়ে সে সুর, সেই বিহ্বল করুণ সুর মসিনার মনে গিয়ে ঘা' দিলে, তার কানে গিয়ে পঁহুছল। ছেলে মানুষ, ছোট্ট মেয়ে, কিন্তু ঠিক্ বুঝলে সে এ সামসেরের বাঁশী—তাকে ডাক্‌ছে।

কিন্তু তাকেই ত ডাক্‌ছে সামসের—একা সে, সাথী চায়। তার হারাণ মাকে আর ফিরে পাবে না। তাঁকে ডেকে ডেকে সে আর স্থির থাক্‌তে পারছে না। মায়ের তর্পণ শেষ ক'রে সামসের তার সমজুটির আহ্বানে ব্যাকুল। মসিনা স্থির থাকে কি ক'রে সে বাঁশী শুনে? শ্যামের বাঁশী এ নয়। 'যমুনার' দুকুল বেয়ে উজান খেলে যেত যে সুরলহরীতে, ঠিক এ বাঁশী তা নয়। কিন্তু 'রাধার' কাছে শ্যামের বাঁশী যেমন কি এক বিশ্ববিমোহন তান তুলে তার প্রাণমন মজিয়ে তাকে বাঁশীর পানে ধাওয়া করাত, মসিনার কাছে সামসেরের বাঁশীও তাই—সবটাই তাই! এ বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে সামসের যমুনার কাল জলে ঢেউ উঠাত কি জানি না ; কেঁপে কেঁপে সে জলে এ বাঁশীর সুরে উজান বইত কি জানি না—কিন্তু মসিনার কাল চোখে টল্ টল্ ক'রে অশ্রু ভ'রে উঠত—তাকে অনেক দূর থেকে ছুট্ করাত সামসেরের পানে এই সামসেরেরই বাঁশের বাঁশীর 'ফুঁ'। তুন্ গাছের গোড়ায় সে বাঁশী বাজাত—ঝরণার পানে তাকিয়ে থেকে।

"ঐ বনের ভিতর সামসের বুঝি বাঁশী বাজায়; আয় ভাই আমরাও যাই সেথা। গাছের ডালে দোলা খাটিয়ে দুলব'খন।"

কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি কোথা? সেথাকার সে গহন বন, তায় সে দিনকার বাদল! সেই বাদলা দিনের কালো মেঘের গুরুগর্জ্জন; মাঝে মাঝে শুধু সেই চোঙা বাঁশীর মধুর সুর। দড়ি নেই দোলা খাটান যাবে কি ক'রে? আবার সে নিবিড় বনের এ পার থেকে ওপার পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে কুয়াশার ঢেউএ ভাসিয়ে দিয়ে পাখীর গানের মত বেজে উঠল সামসেরের বাঁশী। অনেক ঘুরে ঘুরে মসিনা বাঁশীর সুর লক্ষ্য ক'রে সেই নির্জ্জন বনে সামসেরের পানে ছুটে চল্‌লো। সাথীরা তার কেউ গেল না; বাদল বড়, তাই বাড়ী ফিরে গেল।

ছুটেছে মসিনা শুধু একা—নিবিড় বনের ভিতর। হঠাৎ একটু পূবের হাওয়া ছোট বড় সব গাছগুলোর পাতা নাড়িয়ে দিয়ে, ঘুমন্ত পাখীছানাগুলোকে জাগিয়ে দিয়ে, ফোটা আফোটা কত ফুল ছড়িয়ে দিয়ে, তাদেরই আকুল গন্ধে ভেসে পড়ে হু হু ক'রে পশ্চিম দিকে ব'য়ে গেল। সেই সঙ্গে বড় বড় ফোঁটা, বৃষ্টির ফোঁটা টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে বনগোলাপের সবুজ পাতায় ঝরে পড়ল্। মসিনা তখনও ছুটেছে; সামসেরের বাঁশীর সুর লক্ষ্য ক'রে তার 'দাজুর' পানে ছুটেছে।

হাওয়া বইতে সুরু হ'ল। বেশ জোরেই হাওয়া বইতে লাগল। পাহাড়ে এরকম হাওয়া কখন বয়ে যায় তার ঠিক নেই।

হু হু ক'রে বাতাস বইতে লাগ্‌ল। ছোট বড় সব গাছপালাই দুলে উঠল। বৃষ্টিও হয়—হাওয়াও বয়; আবার সব কুয়াশায় ঢেকে ফেলে। অবেলার ম্লান সূর্য্যালোকটুকুও মেঘের আড়ালে প'ড়ে সাঁঝের বেলাকে আগিয়ে দিয়ে অন্ধকারকে ডাক দিয়ে গেল। চারিদিকেই সাঁঝের ছায়া জলহাওয়ার সাথে চতুর্দ্দিক ঘিরে নিলে। সামসেরের বাঁশীও বন্ধ হ'ল।

উঠল সামসের; সুরের আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াল; কাঠের বোঝাটীর দিকে চাইলে একবার। আর একবার চেয়ে দেখ্‌লে আকাশের পানে। আঁধার ত ঘনিয়ে এসেছে—একখানা কাল মেঘ, জমাট কাল মেঘ ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে এগিয়ে চলেছে। শুধু মেঘের গুরুগর্জ্জন নয়, ঝিকমিকি বিদ্যুৎ হান্‌ছে, আর টপ্‌ টপ্‌ শব্দে বড় বড় ফোঁটা—বৃষ্টি নাম্‌ল ত! মনে পড়ল সামসেরের ঘরে ফিরতে হবে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল—বনের ভেতর ছাড়া ছিল তার গরুটী। ধরে আন্‌লে তাকে। গরুর দড়ি এক হাতে, পিঠে কাঠের বোঝা, আর এক হাতে তার ছোট্ট বাঁশী—চল্লো সে ঘরের পানে। কিন্তু মসিনা ত আজ এলোনা! দুর্য্যোগ বলে বোধ হয়!

চারিদিক অন্ধকার তখন—ঘোর কাল অন্ধকার। তারই মাঝে গাছের ফাঁকে ফাঁকে হীরের মত ঝক্‌ ঝক্‌ করছে সহস্র জোনাকী—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো, আর ভিজে মাটীর সাঁতা গন্ধ সমগ্র বনটী পূর্ণ করে রেখেছে। সেই অন্ধকার

মাঝেই চল্লো সামসের তার গরুটা নিয়ে আর নিয়ে সারাদিনের কাটা কাঠের বোঝাটা।

কিছু দূর এগিয়ে এসেই বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলে—সাদা মত কি একটা পড়ে রয়েছে। আবার বিদ্যুতের আলো—এগিয়ে শেষে কাছে এল; আর একবার বিদ্যুৎ! মসিনাই ত—মন বলছে সে এসেছে; এসেছে ত মসিনা। সারা পথটা ছুট্তে ছুট্তে আহা পাথরে আছাড় খেয়ে পড়েছে। বাঁশীর ডাক শুনে আস্তে আস্তে অন্ধকারে পাথরে লেগে পড়ে গেছে, এই একটু আগেই পড়ে গেছে, লেগেছে উঠতে পারেনি। লেগেছে খুব কি—তাই কাঁদছে?

গায়ে হাত দিতেই মসিনা ডাক্লে—

"দাজু"

"বোন্" ব'লে সামসের গরুর দড়িটা ধ'রে রেখে কাঠের বোঝা ফেলে দিলে পিঠ থেকে। মসিনাকে কোলে তুলে নিয়ে সামসের—বল্লে—"কি ক'রে পড়ে গেলি কাঞ্চি?"

"তোর কাছে আস্ছিলুম দাজু; অন্ধকারে দেখতে পাইনি—এই ঢিবিটায় ঠুকে আছাড় খেলুম। পায়ে বড় লেগেছে।"

"কেন এলি এরকম সময়? তাতে হাওয়া বইছে—বৃষ্টিও প'ড়ছে মাঝে মাঝে!"

"সন্ধ্যা যে সকাল সকাল হ'ল দাজু। বৃষ্টি আস্বে কি জান্তুম?"

"বৃষ্টি ত অনেকক্ষণ থেকেই আসি আসি করছে মসিনা—

তুই নিশ্চয় মেঘ দেখেও ছুটে ছুটে এই অন্ধকারে আসছিলি—কেন এলি ?"

আর সাড়া নেই। কাঠের বোঝাটা ফেলে রেখে কোন রকমে সামসের মসিনাকে কোলে তুলে নিলে। কোলে নিয়ে চল্‌লো সামসের—বল্‌লে—

"আর কোথায় লেগেছে ?"

"আর কোথাও নয় দাজু—শুধু পায়ে।"

"বড্ড লেগেছে ?"

"না না—তুই কাঠের বোঝাটা ফেলে দিলি ? আরে, কাল কি বিক্রি করবে তবে বাবু ?"

মসিনা এমন কথা প্রায়ই বলে—বড় কষ্টে বলে। সামসেরের রাগ হয় না, কোলে চেপে ধরে মাসিনাকে। আজও এ অবস্থায় মসিনাকে সে ভাবনা ভাবতে দেখে সামসেরের চোখে জল এল। ভিজে চোখে অন্য মনে বল্‌লে সামসের—

"তোর কোথা লেগেছে কাঞ্চি ?"

"বল্লুম ত পায়ে—সে বেশী না, একটু।—তুই কাঠগুলো নেনা দাজু।"

"সে ফিরে এসে নিয়ে যাব। আগে তোকে বাড়ী রেখে আসি।"

গাছগাছা কি তুলে সামসের জঙ্গল থেকে, মসিনার পায়ে প্রলেপ দিলে—একটু পাতার রস খাইয়ে দিলে। সামসের দিলে—মসিনা খেলে। খানিকটা জামা ছিঁড়ে সামসের মসিনার পায়ে জড়িয়ে বেঁধে দিলে। তার পর মসিনাকে পিঠে নিয়ে সেই দারুণ অন্ধকারে সেই প্রকাণ্ড নির্জ্জন অরণ্যের মধ্য দিয়ে চ'লে গেল সামসের। কাঠের বোঝা ফেলে শুধু গরুর দড়িটি ধরে চল্‌লো সামসের তার ভালবাসার ধনকে পিঠে নিয়ে ঘরের পানে।

২

সে সব অনেকদিনের কথা। আজ থেকে প্রায় একশ বছর ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে সে সব দিন দেখতে পাওয়া যায়—কি তারও বেশী; যে সময় নেপালে যুদ্ধ হ'য়েছিল, সেই সময়কার কথা। তখন এ সব জায়গায় আসা একটা দুর্ঘট ব্যাপার ছিল; আসা যাওয়ার পথও এত সোজা ছিল না, আর এ পথে অন্য দেশের লোকেরও গতায়াত ছিল না বেশী।

আজ যা কার্সিয়ং বলে বিখ্যাত, 'হাওয়া-খানে' বাবুদিগের প্রিয় স্থান, এ দেশের লোকে তাকে 'খর্‌শান' বলেই জান্‌ত—এ টুঙ্‌ ত—খরশান থেকে আরও কিছু উত্তরে। খর্‌শান থেকে আস্‌বার পথে এই টুঙ্‌ জায়গাটির কাছ বরাবর এই "সীপাহি ঝোরা"—এ ঝরণা আজ যে অবস্থায় রয়েছে তখন এতটা ম্রিয়মান ছিল না সে। "পাগলার" মত না থাক্‌লেও 'পাগলা ঝোরার' মত ছিল কতকটা। এত বাঁধুনি তখন এর ছিল না। স্বেচ্ছায় ফুলে ফুলে নেচে নেচে গর্জ্জন ক'রে ঝরে পড়ত ঝোরার জল।

এই সেপাই ঝোরার কাছে খরশানের শেষেই টুঙের সুরু।

সেপাই-ঝোরা

এই খানেই সেই 'সেপাই ধুরায়' ছিল সামসের আর মসিনাদের বাস। এই ধুরাটার ওপর ছিল মসিনাদের বাড়ী। তার বাবা খুব পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন। বড় লোকও ছিলেন, বেশ ভাল লোকও ছিলেন। মসিনা তাঁর ছোট মেয়ে—খুবই সুন্দরী দেখ্‌তে ছিল। সব 'ছেলে পুলে' মরে গিয়ে মসিনাই ছিল তার মায়ের কোল আগুলে। বড় আদরের মেয়ে ছিল সে। ছেলেবেলা থেকেই সরলা প্রকৃতির মেয়ে ছিল মসিনা, পাড়ার সবাই তাকে ভালবাস্‌ত। ছোট মেয়ে বলে সবাই তাকে ডাক্‌ত 'কাঞ্চি' বলে। বাপেরও পয়সার অভাব ছিল না; মেয়েরও আদর যত্নের ক্রটী হ'ত না। থাক্‌ত সে বেশী সময় সামসেরের কাছে—'দাজু' বলে ডাক্‌ত তাকে।

জঙ্গবীরের ঘর ছিল মসিনাদের বাড়ীর কাছেই। তারও ঐ একটি ছেলে সামসের। মা ছিল না সামসেরের, মসিনার মাকেই সে ভালবাসত মায়ের মতন, ডাকতও 'মা' বলে। ছোট হ'লেও সামসেরদের ঘরখানি বেশ একটি মাঝারী রকমের পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে দূরদূরান্তর পানে চেয়ে থাক্‌ত। ঘরের দরজাটি পার হ'য়ে সামনের ছোট উঠানটিতে দাঁড়িয়ে বড় কাছে বোধ হ'লেও সেই সুদূর হিমালয়ের সারিটির পানে চেয়ে থাক্‌ত সামসের। আর কতদিন আপনহারা হ'য়ে সেই উঁচু সোনার চূড়াগুলোর দিকে চেয়ে দেখ্‌ত। চেয়ে থাক্‌ত সেই মনোহর সুবর্ণবৎ হিমগিরি-শিখর তিনটির পানে সেই জনু, কাব্রু আর কাঞ্চনজঙ্ঘা। আজও যেমনটি দেখা যায়, তখনও ঠিক এমনিই দেখা যেত। কত

দিন এই অসীমের পানে চেয়ে সামসের বাঁশী বাজিয়েছে। কত দিন একা বাজিয়েছে—কত দিন বুড়া বাপ তার কাছে এসে বসেছে। কত দিন মসিনা এসে বলেছে—"দাজু—"সেই গানটা বাজানা।"

* * * *

কোথায় আলুবখরা আর কোথায় পীচ, মসিনাকে ভোলাবার জন্তে সামসের বনজঙ্গল পার হ'য়ে ফল পেড়ে আনত। ফল এনে দিত, ফুল তুলে দিত। মালা গাঁথতে পারত না মসিনা, জানত না তারা। শুধু ফুল নিয়েই খেলা করত; সামসের গাছের গোড়ায় ব'সে থাকত মসিনা তার মাথায় ঢেলে দিত সব ফুল গুলো, কোঁচড় উজাড় ক'রে।

বয়স হ'তে লাগল সামসেরের; মসিনাও বাড়তে লাগল। এক 'পাহাড়ী-লামা'—লামা তারা ঠিক নয়, তারাই ডাকত তাই বলে—সেই জনকতক ছেলেমেয়ে নিয়ে লেখাপড়া শেখাত তাদের। একটু একটু পড়া শেখাত, একটু একটু কাজ শেখাত। লোম নিয়ে পশম করা, পশম থেকে জামা বোনা এই রকম সব কাজ শেখাত। মসিনার বাপ ঝোঁক ধরে তাকে "লামার" স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলে। জঙ্গবীর বড্ড গরীব; তার ছেলেকে পড়াবার ক্ষমতা ছিল না, নিজের বুড়ো বয়সে ছেলেকে ছেড়ে দেবারও সুবিধা ছিল না; একা সে সব কাজ করতে পারত না। অনেক কাজই করত সামসের। কাঠ কাটত, গরু দেখত, বুড়া বাপকে যত্ন করত।

সেপাই-ঝোরা

মসিনা 'লামার' কাছ থেকে পালিয়ে আস্‌ত সামসেরের কাছে। তার সঙ্গে 'কপির' বাগান করত, মাটী খুঁড়ত, ঝোরা থেকে এনে জল ঢাল্‌ত। দিনের অধিকাংশ সময়ই প্রায় দুজন এক সঙ্গে কাটাত। ভুট্টা, আলু, কপির বাগানে, না হয় বনে জঙ্গলে গরু চরাতে, কাঠ কাট্‌তে তাদের সারা দিনটা কেটে যেত। সাঁঝের কালে যে যার ঘরে গিয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত।

এমনি করেই দিন কাটত তাদের সুখদুঃখের মাঝে। মনের মিল ছিল দুজনের খুব, বড় মেলা মেশা করেই দুটী পরিবারের দিনগুলো চলে যেত। 'লামার' কাছ থেকে রোজই পালিয়ে আস্‌ত বলে মসিনার ওপর রাগ হ'ত সামসেরের। একদিন মসিনা মোটেই পড়তে গেল না; বাড়ী থেকে বরাবর সামসেরের কাছে চ'লে এল। সে দিন খুব রাগ হ'য়েছিল সামসেরের। বড্ড বকেছিল সে দিন মসিনাকে। খুবই বকেছিল—তাতেও মসিনা পড়তে গেল না; কথা শুন্‌লে না বলে রেগে সামসের মসিনাকে মেরেছিল। তারপর মসিনা চলে গেল; ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চ'লে গেল। ডাক্‌লে না সামসের তাকে, ফিরে আস্‌তেও বল্লে না। আর মসিনাও স্থির থাক্‌লে না। অভিমানভরে চলে গেল, কিন্তু পড়তে গেল না, বরাবর নিজের ঘরে চলে গেল।

মসিনা চলে যেতে আর ভাল লাগ্‌ল না সামসেরের; একবার ভাব্‌লে ডেকে আনি—মন কই শান্ত থাকে না; আবার ভাবে—না, আজ আর থাক্। কুয়াশায় যেমন চারিদিক ঢাকা পড়ে ছিল,

মনটাও সামসেরের তেমনি কি একটা বেদনায় ঢাকা পড়েছিল। বনে বসে বসে কত কি ভাবতে লাগল সে; ঝরণাটাও পাশে আপন মনে ঝর্ ঝর্ শব্দে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। একবার মসিনার কথা ভেবে, একবার কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের পানে চেয়ে কোন মতেই মনটাকে গুছিয়ে রাখতে পারছিল না সে। কেবলই বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠছিল। আস্তে আস্তে বন ছেড়ে উঠে সামসের ঝরণাটার মাঝে গিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর বসে পড়ল। ক্রমাগত শীতের স্পর্শে সারা সহরের লোকগুলোকে জমিয়ে দিয়ে কুয়াশাটা কখন যে সরে গেছল সামসেরের অলক্ষ্যে, তা বুঝতে পারেনি সে যতক্ষণ না পড়ন্ত রোদ ঝরণার ঝরঝরে জলগুলোকে সোণার রঙে রঙিয়ে দিয়েছিল।

কত কি ভাবছিল সামসের একা বসে বসে, ভাবনার বুঝি তার কূল কিনারা ছিল না। সারা চিন্তা-সমুদ্র মন্থন করেও বোঝাতে পারলে না সে নিজেকে, এই চব্বিশ ঘণ্টা ঝর ঝর শব্দে এত জল কোথা থেকে এসে পড়ছে। কত জল আছে? কবে থেকে পড়তে সুরু ক'রেছে, আর কবে এ শুখিয়ে যাবে? মসিনার চোখেও এমনি করে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে? পড়ছে যদি শুখোবে একদিন; না এই ঝরণারই মত অফুরন্ত জল চোখ বেয়ে পড়বে তার, শুখোবে না? হাঁ কত বরফ আছে যা গলে গলে এত জল? না জমছে এ বরফ, রোজ জমে রোজ গলে—কত বরফ যে এই ঝরনাগুলোর কুলুনাদে গড়িয়ে পড়ার বিরাম নেই।

সেপাই-ঝোরা

বিরাম নেই বিশ্রাম নেই অনাবিল স্রোত ; অষ্ট প্রহর ঝর্ ঝর্ ঝর্ তাইত এর নাম 'ঝরণা'— পাহাড়ী তারা, তারাও বলে 'ঝোরা'। বড় বড় চাঁই পাথরের 'এব্ড়োখেব্ড়ো' ধারগুলোও নিখুঁত গোল হ'য়ে গেল। কেউ বা গড়াতে গড়াতে গিয়ে অসীম কোন অকূলের পারে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। মসিনা বুঝি কাঁদ্ছে এখনও, না বাড়ী ফিরে গেছে!

সূর্য্য তখনও ডোবেনি।

৩

নিজের ঘরে চলে গেল সামসের। দুধ গরম করে তাই তার বুড়ো বাপকে খাইয়ে শুলো সে; কিন্তু ঘুমাল না; ঘুম এলো না। কত কি ভাবতে লাগল—মসিনা কত কেঁদেছে, বোধ হয় বড় লেগেছে তার। আহা আর তাকে 'লামার' কাছে যেতে বল্‌ব না। কি হবে পড়ে তার? কিন্তু তার বাবু শুনলে মারবে তাকে। আজ গিয়ে যদি বলে 'দাজু মেরেছে আমায়'—না বল্‌বে না। বলে ত আমাকে ত বক্‌বে, রাগ করবে তার বাবু কত?

ভোরে জঙ্গবীরকে চা ক'রে দিলে সামসের, চা খাইয়ে বুড়া বাপকে নিজে চল্‌লো ডাকতে মসিনাকে। দরজার পানে এসে যেই দাঁড়াল সামসের অম্‌নি কে বাইরে থেকে ঘা দিলে দরজায়—"দাজু।"

সামসের ত চিন্‌বেই, টিনের দরজায় সে টুং টাং আওয়াজ ত বড় চেনা সামসেরের; কত চেনা, কত আদরের সে ডাক—'দাজু'! ছুটে গিয়ে দোর খুলে দিলে সামসের; কত কথা কইলে উঠানে বসে, কত আদর করলে সে দিন। বনে গিয়ে অন্য

দিনের চেয়ে বেশী ক'রে ফল পেড়ে দিলে, ফুল তুলে দিলে; কত গল্প করলে, কত সুর বাজালে তার ছোট্ট বাঁশীটীতে। কিন্তু মসিনা সে সবে ভোলেনি, ফল ফুলে তার মন নেই বাঁশীর সুরে তার কান নেই। অনেকক্ষণ পরে সে সামসেরের পানে চেয়ে ডাক্‌লে—

"দাজু"—

"কেন রে ?"

"আর পড়তে যেতে বলিস্‌নি আমায়—।"

"কেন বল্‌।"

"তোকে ছেড়ে কি ক'রে থাক্‌ব সেথা ?"

"হ'লই বা, আবার বিকালে ত—"

"ধেৎ, কে খেল্‌বে আমার সঙ্গে সারাদিন ?"

"কেন ? পড়ে এসে খেলা করবি।"

"না, তুইও যদি যাস্ পড়তে, তবে যাব।"

"কি করে যাব আমি—কাঞ্ছি ?"

"তবে কেন আমাকে যেতে বলিস্ সেথায় ?"

"বেশ, আর যেতে বল্‌ব না আমি। কিন্তু তোকে তোর বাবু বক্‌বে বড্ড।"

"নারে বক্‌বে না।"

"কেন বক্‌বে না, শুন্‌লেই বক্‌বে দুজনকে।"

"বাঃ—জান্‌বে কি ক'রে ?"

"সে কি ! ঠিক বুঝ্‌তে পারবে বাবু।"

"কেন 'খেয়ে-দেয়ে' পালিয়ে আসি ত এখানে—তার পর বনে চলে যাই দুজনে তাহ'লে ?"

" 'লামা' ব'লে দেবে ত ?"

"দূর তা কেন ; তবে বাবুকে বলব—আমি যাব না তার কাছে, সে যা মারে।"

* * * *

ঠিক তাই হ'ল। 'লামা' মসিনার বাবার কাছে বলে পাঠালে মসিনা কই আসে না। আরও বলে দিলে মারপিঠ করে সামসের মসিনাকে ; তবুও মসিনা সারাদিনটা তার পাছে পাছেই কাটায়। মেয়েরও বয়স হচ্ছে দিন দিন ; এ রকম করে দিন কাটালে চলবে কি ক'রে ? সামসেরেরও স্পর্দ্ধা বড়, সে মসিনার গায় হাত তোলে ! সে না চাষা জঙ্গবীরের ছেলে—অন্নের কাঙাল !

এই ভাবে অনেক দিন কেটে গেছল, যেতও। কিন্তু তা'ত হবার নয়। বড়লোক যে সে ত গরীবকে ভালবাসে না। লামার কথা শুনে মসিনার বাবা রেগে গেল জঙ্গবীরের ওপর, ভয়ানক বিরক্ত হ'ল সামসেরের ওপর। সামসেরের মসিনাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ হ'ল। মসিনার মা কত কাঁদ্‌লে সামসেরের জন্যে ; বল্‌লে ছেলেয় ছেলেয় হয় অমন। আর মসিনারই বা পড়তে গিয়ে কি হ'বে ? কিন্তু সে কথা শুন্‌লে না মসিনার বাবা। তাদের খুব বকে দিলে। মসিনাকেও বল্‌লে—সে যেন সামসেরের কাছে না যায়। কিন্তু তবুও যেত মসিনা, লুকিয়ে লুকিয়ে যেত সামসেরের কাছে বনে জঙ্গলে যেখানে তার বাঁশী বাজ্‌ত।

লুকিয়ে গিয়ে মসিনা, সামসেরের বুড়ো বাপকে দেখা দিয়ে আস্ত আর লুকিয়ে সেথায় দুধ খেয়ে আস্ত সামসেরের বুড়ো বাপের কাছে।

আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে যে দিন বড্ড লেগেছিল মসিনার, সে দিন সেই দুর্যোগে সামসের তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে গরম দুধ খাইয়ে পায়ে ওষুধ বেঁধে দিয়ে মসিনাদের বাড়ী দিয়ে এল মসিনাকে। তাই দেখেই বেশ বিরক্ত হ'য়েছিল সামসেরের ওপর মসিনার 'বাবু'। মসিনাকে জিজ্ঞাসা করলে কি ক'রে পড়ে গেল সে। মসিনা বললে দুর্যোগে বনে পিছল হ'য়েছিল সে ছুটতে গিয়ে পড়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে সামসের গরু নিয়ে ঘরে যাচ্ছিল, সে পড়ে গেছে দেখে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে দুধ খাইয়ে, পায়ে ওষুধ বেঁধে দিয়ে ঘরে রেখে গেল। তা কিন্তু বিশ্বাস করলে না তার 'বাবু'। কি ক'রে সামসেরকে নজরছাড়া করবে তাই ভাবতে লাগল। বড়লোক সে, বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না।

লামা শুনে সে কথা বললে মসিনারই মিছে কথা। সামসের নিশ্চয় তাকে কোন কারণে মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল, আরও মার খাওয়ার ভয়ে স্বীকার করছে না মসিনা। সামসেরদের তার চেয়ে এখান থেকে সরিয়ে দাও, যাতে আর না সে মসিনার কাছে আসতে পায়। মসিনার বাবার কথাটা খুব ভাল লাগল। জঙ্গবীরকে তাড়াবেই সে সেখান থেকে— তারই ছেলেটা ত মসিনার মাথাটা খেলে।

সেদিনকার সে দারুণ দুর্য্যোগের দিনের ঘটনাটাই কাল হ'ল। মসিনার বাবা জঙ্গবীরদের উঠিয়ে দিলে। তারা শেষে টুঙের একটা জায়গায় উঠে গেল, বড় গরীব হ'য়ে গেল তারা, চাষ-আবাদ যা করত সব বন্ধ হ'য়ে গেল। খাবার পয়সা পর্য্যন্ত তাদের আর রইল না। সামসেরের মা ছিল না ব'লে জঙ্গবীর তাকে বড় ভালবাস্ত; টুঙে গিয়ে কোন রকমে তারা দিন কাটাতে লাগল।

একটা কাঠের দোকান খুলে দিলে কিছুদিন পরে জঙ্গবীর, সামসের কিন্তু দোকান চালাতে পারলে না। কাঠও বড় কেউ কিন্‌ত না। শেষে নিজেরা না খেয়ে গরুর দুধ বেচে পেটের খোরাক জোগাড় করতে লাগ্‌ল। বড় কষ্টে দিন কাটতে লাগল তাদের। সামসেরের মন আর বসেনা কিছুতে।

৪

যখন সামসের তার বাপের কাছে শুন্‌লে যে মসিনার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া অসম্ভব, তখন বড় দুঃখ হ'ল তার। মসিনারা বড় লোক, তার বাবা কাঙাল সামসেরের সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেবে না, আর রাজী হ'লেও অনেক টাকা চাইবে; অত টাকা সে পাবে কোথা? একরকম হতাশ হ'য়ে পড়ল সামসের—শেষে মনে মনে স্থির করলে জীবন যায় সেও ভাল তবু সে মসিনাকে বিয়ে করার চেষ্টা করবেই। টাকাই ত প্রধান অন্তরায়! পয়সা হ'লে বুঝি মসিনার বাপের আর আপত্তি থাক্‌বে না। কিন্তু তার রাগ পড়বে কি? পড়বে। পয়সা হ'লে সামসেরের আর কিছুই ভাব্‌তে হ'বে না, কিন্তু পয়সা রোজগার করতেও ত দু'দশ বছর কেটে যেতে পারে, মসিনার ততদিনে যদি বিয়ে দিয়ে দেয়? না, মসিনা বিয়ে করবে না।

দুটী বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাটিয়ে দিলে মসিনা সামসেরের চিন্তায় বিভোর হ'য়ে। টুঙে যাবার জো রাখেনি তার বাবু সামসেরের সঙ্গে এই দুটী বছর দেখা হয়নি। কতদিন আরও হবে না, হয়ত আর দেখাই হ'বে না। বাপ্‌ ত তার বুঝলে না

মেয়েকে তার তিল তিল ক'রে দগ্ধে মারার জন্যে কি আগুন সে জেলে দিলে! পড়তে যাওয়া ঢের দিন বন্ধ হ'য়েছে—শরীর তার আর কিছুতেই টেকে না। সন্ধ্যা হ'লে খেলাধূলার পর তুজনে যে যার ঘরে ফিরত—সেই পুরাণ কথাই থেকে থেকে তার মনে পড়ে। পরস্পরের চিন্তা আর কেউই ছাড়তে পারেনা।

মসিনার বাপ সেটা লক্ষ্য করেছিল, ভাব্‌লে মেয়ের ঘটা ক'রে বিয়ে দিলে সব ভাবনা চিন্তা দূরে চলে যাবে, সব গোল মিটে যাবে—কিন্তু কপালে তুঃখ লেখা থাক্‌লে কে ঘোচাবে? বাবু—তার? সামসেরকে ডেকে এনে যদি মেয়ের বিয়ে দিত কি অন্ততঃ তাকে আবার ফিরিয়ে আন্‌ত তাহ'লে হয়তো এতটা হ'ত না। কিন্তু সামসেরের তোষামোদ করা তার মর্য্যাদায় শোভা পাবেনা ব'লে পারেনি মসিনার বাবা। তবু মেয়ে তার [illegible] শুথয়ে যেতে লাগ্‌ল।

সামসেরদের আর দিন কাটে না; কোন রকমে যেন সামসের তার বুড়া বাপের জন্যেই যাহোক কিছু জোগাড় ক'রে খাওয়াত তাকে। আর আগুলে রেখেছিল যেন সেই বুড়া জঙ্গবীরকে তুনিয়ায় তার আর কেউ নেই ব'লে। কিন্তু বুড়াও আর টেকে না বুঝি। ঘরে বসে বসে ভাবত সামসের কেমন ক'রে মসিনাকে পাবে সে। অনেক টাকা হয় ন' তার? কি ক'রে হ'বে—নেপালে যুদ্ধ সুরু 'হয়েছে সেই যুদ্ধে চলে যাবে সে। কি ক'রে যাবে তার বুড়া বাপকে ফেলে? তা হয় না জঙ্গবীরকে ফেলে সে কিছুতেই যুদ্ধে যেতে পারবে না; তবে—তবে ঠিক

কথা, মসিনাকে লুকিয়ে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে আস্‌বে! তাও কি হয়? মসিনার বাবা যখন জান্‌তে পারবে—খুঁজতে খুঁজতে যখন বার করবে, খবর পাবে মসিনাকে চুরি ক'রে এনেছি আমি, তখন কি হ'বে! দুর হোক্—বাবা যদি না বাঁচে? তাকে এমন করলে কে? মসিনা, তার জন্যেই ত এত—না তারই বা দোষ কি? দোষ তার বাবুর; তার বাবুর জন্যেই ত আজ আমরা এখানে। জঙ্গবীরকে ত মারতে বসেছে সেই!

কত কি ভাবতে লাগ্‌ল সামসের; তার একবার রাগ হয় মসিনার ওপর, পরক্ষণেই রাগ হয় তার বাবার ওপর। কিন্তু বুড়ো জঙ্গবীর আর টিক্‌ল না; একটা নিদারুণ শীতের দিনে জঙ্গবীর তার আদরের সামসেরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল। চিরদিনের মত ছেলেকে তার একা ফেলে রেখে জঙ্গবীর কোন্ অজানা পথের উদ্দ্যেশে চলে গেল। কত কাঁদলে সামসের, বাপের ঠাণ্ডা দেহখানির—হিমের মত শীতল বুকখানির ওপর মুখ রেখে কত কাঁদ্‌লে সামসের—কিন্তু বৃথাই। জঙ্গবীর আর ফিরে চাইলে না। কেঁদে কেঁদে সেই দিন বাপের মৃতদেহখানি কাঁধে নিয়ে সাঁঝের অন্ধকারে সামসের কোথায় চলে গেল—কেউ তা আর দেখ্‌তে পেলে না।

* * * *

জঙ্গবীর আর নেই শুনে কত কাঁদলে মসিনা। কেঁদে কেঁদে আকুল হ'য়ে সে ফিরে বেড়াতে লাগ্‌ল। লোকের মুখে শুনলে সামসেরও যুদ্ধে চলে গেছে। কত কাঁদে মসিনা, কাঁদার

তার বিরাম নেই। বাপ তার কত বোঝালে মেয়েকে—ওরে পাগলী সামসেরকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেল। যুদ্ধে গেছে সে, সেখান থেকে সে কি আর ফিরবে? কত ক'রে বুঝিয়েও মেয়ের মন পেলে না বাপ তার। শেষে ঠিক করলে এইবার একটা বিয়ে দিলে মেয়ের মন ঠিক হ'বে; শীঘ্রই ভুলে যাবে সামসেরদের। কিন্তু বুঝলে না তখনও তার বাপ মেয়েকে সোহাগ দেখাতে গিয়ে, বেশী ক'রে যত্ন দেখিয়ে, তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে কি করতে বসেছে। আহা! কি ভাঙ্গা কপাল মসিনার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলে মসিনা—দাজু কি আর ফিরবে?

শেষে কত ভেবে মসিনার বাবা এক বড় ঘরের ছেলে 'ভুপালের' সঙ্গে একরকম জোর ক'রেই তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে। মসিনার শত অনিচ্ছা, অফুরন্ত কান্নাও এ অত্যাচারের পথে বাধা দিতে পারলে না। বিয়ের পরও মসিনা বদলাল না; শ্বশুরবাড়ী গিয়েও সে তেমনি অন্য মনে দিন কাটাতে লাগল। বাপের ঘর, শ্বশুর ঘর সবই সমান তার। শরীরে তার আর কিছু ছিল না। পাঁচটা বছর—সামসেরদের উড়ে উঠে যাওয়ার পর থেকে পাঁচটা বছর তিল তিল ক'রে ক্ষুন্ন হ'য়েছে। একা কত কাঁদে; দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে এক একবার একটা ছোট্ট কথা 'দাজু' অলক্ষ্যে তার মুখ দিয়ে বার হ'য়ে পড়ে।

মসিনা ত এ বিয়েতে সুখী হ'তে পারেনি, ভুপালও সুখী হয়েছিল কৈ? আর সামসের? সে ত প্রাণ মন দিয়ে মসিনাকে

ভালবেসেছিল। কত বিশ্বাস ছিল তার মসিনার ওপর। তাকে ছাড়া আর কারুকেও বিয়ে করবেনা মসিনা, একথা মুখ ফুটে কোন দিন না বল্‌লেও সামসেরের মনে নিশ্চয়ই সে আশা ছিল ; মসিনার মনেও পোষা ছিল বুঝি সে কথা, কিন্তু পোষা থাকল কই ? সে আজ সামসেরের কাছে অবিশ্বাসিনী। না—কেন তার দোষ কি ? এ বিয়েতে ত মসিনার কোন হাতই ছিল না। বরং সে কপাল-দোষে ভূপালের কাছে অবিশ্বাসিনী। কিন্তু এ-অপরাধের মূলে ত সে নয়। তার বাবু ? না—সামসের কেন তাকে ফেলে টুঙে গেল—টুঙ থেকে যুদ্ধে গেল—যুদ্ধ করতে সত্যই যদি নেপালে গেল, কেন গেল সে ? তারই বা দোষ কি ? মসিনার বাপই ত তাদের তাড়িয়েছে, তাদের না তাড়ালে ত এমন অবস্থা হ'ত না তার ! সেও কি ঠিক ? আহা ! বুড়া জঙ্গবীরও আর নেই—কেন নেই ? তারই কপাল দোষ। লেখা আছে যা কপালে তার বাইরে কে কাজ করবে ; অদৃষ্টের খণ্ডন হবার জো নেই যে ; কিন্তু মন বুঝে কৈ ?

৮

শীতকাল্ দারুণ শীত। তায় আবার হিমালয়ের ক্রোড়দেশ, অসহ্য শীত, সব হিমে ঢাকা। এ দারুণ হিমে সামসের একা; একা সে অবেলায় দিনের শেষে পর্ব্বতারোহণে আনমনা। উপলখণ্ডের আঘাতে, কঙ্করাদির নিষ্পেষণে পদদ্বয় তার ক্ষত বিক্ষত। কি উৎসাহ! কত ক্লেশ সহ্য ক'রে চলেছে সে কোথায়? যুদ্ধে—না—আরও কিছুর অন্বেষণে? ক্ষুধা নেই, তৃষা নেই, ভয় নেই, ক্লান্তি নেই; আছে শুধু উদ্বেগ! চাঞ্চল্য—তাও বুঝি নেই। কি অদম্য উৎসাহ! স্নিগ্ধ কোমল দেহ তার শান্ত স্থির; পাদুটী শুধু ধাপে ধাপে আগিয়ে চলেছে। পিতৃমাতৃহীন যুবক সে, কান্নাও তার ফুরিয়ে গেছে। চিন্তার স্রোতে বুঝি তখনও বিভোর বিহ্বল!

*   *   *   *

যুদ্ধ তখন নেপালে খুব জোরেই চলছিল। এই সেই পরিচিত 'নেপাল যুদ্ধ'—একশ' বছরের ওপর হ'য়ে গেল নেপাল তার অদৃষ্টের পরীক্ষা দিয়েছিল। খুব জোরেই যুঝেছিল তারা; 'তরাই' থেকে কামান ব'য়ে ব'য়ে পাহাড়ের ওপর উঠিয়েছিল।

সেপাই-ঝোরা

সে কি সহজ কথা! গুরখা সেনা সবাই প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে 'হোষ্টিন্' সাহেবকে হারিয়ে দিলে। এই যুদ্ধে সামসের প্রাণ দিয়ে লড়েছিল। সেপাহী হ'য়ে এ যুদ্ধে সামসের যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তা তাদের সর্দ্দারের অগোচর ছিলনা। দেশের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল সামসের। অদম্য উৎসাহে লড়েছিল; বার বার দুইবার ইংরাজ সৈন্যদের হারিয়ে দিলে যখন গুরখা সৈন্য, তখন একবার সামসেরের বাঁচার আশা হ'য়েছিল—যদি মাসিনাকে পায়; কিন্তু পরক্ষণেই সে আশা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রস্তুত হ'ল সে মরতে—এ যুদ্ধে সে প্রাণ দেবেই; দেশের জন্য প্রাণ দেবে সে; মসিনার জন্য মরবে সে। পিতৃতর্পণের জন্য মরবে সে—এ যুদ্ধে সে এসেছে কেন? সকল চিন্তা তার ধুয়ে মুছে একাকার করবার জন্যে এসেছে সে। কিন্তু যুদ্ধে মরবে কেন সে? মাসিনার বাবাকে দেখাবে যে সামসেরের প্রাণ ছোট নয়। গরীব সে সবদিক দিয়ে নয়। হ'তে পারে সে কপর্দ্দকহীন; কিন্তু হলই বা? তবু শোনেনি সামসের মসিনাকে আজ তার বাবা ভূপালের হাতে সঁপে দিয়েছে!

প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করার পরই সামসেরের কৃতিত্ব দেখে, তার ক্ষমতা দেখে, তার প্রাণ দেখে আর দেখে তার সাহস তার উৎসাহ রাজা তাকে 'সর্দ্দার' ক'রে দিয়ে তাকে একটা সেনানীর নায়ক ক'রে দিয়েছিলেন। সামসের তার লোক নিয়ে দ্বিতীয়বার জয়লাভ ক'রে এল কিন্তু তার বামহস্তের বিনিময়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই সামসেরের, খেয়াল নেই, তখনও তার

দক্ষিণ হস্ত বর্ত্তমান, রণে ভঙ্গ দিলেনা সে। জীবন পণ ক'রে পুনর্ব্বার এগিয়ে গেল তারা। গুরখা সৈন্য সংখ্যায় প্রায় অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে তখন, কিন্তু সাহস তাদের তখনও অক্ষুন্ন ছিল। এধারে জেনারল্ 'অক্‌টারলামী' দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরে এসে হারিয়ে দিলে তাদের। শেষে সন্ধি হল সীগৌলীতে; কুমাওন জেলার বিনিময়ে রাজত্ব ফিরে পেলে নেপাল। আজ সেই কুমাওনে সিমলা—দুনিয়ার একটা ভোগ্য স্থান!

শেষ যুদ্ধে আহত হ'ল সামসের। আঘাত মারাত্মক হয়নি। দীর্ঘ ছয়টীমাস ভুগে ভাল হ'ল সে! মরণের পথেও তার শত বাধা। সামসের ভাবলে একটা হাত গেল, প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে বিপন্ন ক'রেই যুদ্ধ করলুম তবুও ত বেঁচে রইলুম; আরও বুঝি কিছু করা বাকী আছে আমার। বাঁচতে হ'বে বুঝি আবার। প্রাণে বাঁচবার আশা হ'ল সামসেরের। কত দিনের পর আজ তার টুঙের যে স্থানটীতে বাপকে তার শেষ রাখা রেখে এসেছিল সেই স্থানটী মনে পড়ল, ঝরণার ধারে মসিনাদের ঘর খানি মনে জাগলো। তাদের পূরাণ ঘরটী সেখানকার মনে হ'ল—আর মনে জাগল 'মসিনা'।

ফিরে চল্‌লো সামসের তার মসিনার পানে যুদ্ধশেষে।

* * * *

সে দিন সেই দারুণ অন্ধকারে বেরিয়েছিল মসিনাও নিজের খেয়ালে; যুদ্ধে কি আদর পেয়েছে তার দাজু, তার প্রাণের সামসের তা তার দেখা চাই। দুর্গম পথ অনেকটা অতিক্রম করে

সেপাই-ঝোরা

সে যখন নেপাল যাওয়ার পথ ধরেছে, সামসের তখন আসছে, জীবনের ব্যথার দিনের সব বোঝা ব'য়ে ব'য়ে পাহাড়ের পথ ধ'রে সেও আসছে।

মসিনার প্রাণে ভয় আছে কি নেই কে বুঝবে। বাড়ীর সবাইকে ঘুমন্ত রেখে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়েছে। সে নৈশ স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ঝরণার কুলুনাদ ছাড়া আর কিছু তখন শোনা যায়নি। বৃষ্টির প্রচণ্ড ধারা কতকটা কমে গেছে। সে নিশীথে কে এই নিশাচর? নির্জ্জন পথে জনপ্রাণী নেই, বুক দুরু দুরু ক'রে কেঁপে ওঠেনা, সে নিদারুণ নিরালার মাঝে প্রাণে ভয় করেনা!

ঘর ছেড়ে মসিনা কতদূর এসে পঁহুছল—কে যেন এগিয়ে তারই দিকে চ'লে আসছে বলে মনে হ'ল কিন্তু বোঝা গেলনা ঠিক সে কে! সামসেরই সে পথে চলছিল ত—কিন্তু বড় ভয় মসিনার পাছে কেউ তার এ নিশীথ অভিসারের পথে বাধা দে', পাছে বাবু তার জানতে পারে কোথায় সে পালিয়েছে। ভূপাল যদি—··· ? আর সে ভাবতে পারলেনা; ভয়ে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল; স্পষ্ট মনে হ'ল একটী কঠোর বিকটাকার মনুষ্যমূর্ত্তি অনেকটা পথ এগিয়ে চ'লে এসেছে।

কে কাকে চেনে? চেনে হয়ত কিন্তু চিনতে পারলেনা। মসিনা বুঝতেও পারলে না—সেই সামসের; যুদ্ধের অবসানে নিজের বামহস্তের বিনিময়ে কতটা কঠোরতা তার প্রাণে সঞ্চিত; কতটা প্রেম সে তার ছিন্নহস্তের বেদনার অনুভূতির সামনে

ধ'রে রেখে যুদ্ধজয় করেছে। আজ চলেছে সে মসিনারই পানে কিন্তু না, এ মনুষ্যমূর্ত্তিই যে! মসিনা আর চল্‌তে পারলে না। ভাবতেও পারেনি সে—আজ নেপাল গিয়ে আজই ত দূরের কথা কোনদিন আর ভূপালের দুয়ারে এসে পৌঁছতে পারবে কিনা। ভয়ে সে বিহ্বল হ'য়ে ফিরে চললো; নিরিবিলিতে চলেছিল, নিশীথেই ফিরে গেল। ভাবলে 'দাজু' ফিরে এলেই দেখা হবে। কিন্তু যদি না ফেরে 'দাজু'!

৬

সামসের এল ফিরে। যে পথ দিয়ে নেপাল গেছ্‌ল সে সেই পথ দিয়েই ফিরে এল, সেই দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত, কত বন উপবন, কত উপত্যকা পার হ'য়ে। কিন্তু যে দীনহীনভাবে, যে বেশে গেছ্‌ল সে, সে বেশ তার নেই। সেপাহীর পোষাক প'রে, স্কন্ধে বন্দুক নিয়ে ফিরছে সে। মাঝে মাঝে বন্দুকের ভর ক'রে পাহাড় ভেঙ্গে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। চলার বিরাম নেই সামসেরের—নেপাল থেকে সে খরশান ফিরে এল। আসার পথে কিন্তু মসিনাকে সে দেখতে পায়নি। টুঙের যেখানে তার বাপের শেষ অস্থিটাও মাটীর আকার ধারণ করেছে, আজ দু'বছর পরে সে তা চোখের জলে ভিজিয়ে এল। এ জগতে তার বাপও আর নেই—মা ত বহুদিন তাকে একা রেখে চলে গেছে। অনেক কাঁদলে সে, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেল্‌লে—ছোট্ট ঘরটী তাদের ছিল যেখানে সে মাটীও বুঝি ভাসিয়ে দিলে, কিন্তু তবু তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। জগতে তার যখন 'আহা' বলবার আর কেউ নেই তখন তাকে সান্ত্বনা দেবে কে?

দেবার মধ্যে ছিল মসিনা; তা সেও আজ অন্যের ঘরে। মসিনা শুনলে শেষে সামসের ফিরে এসেছে—কিন্তু সে কি দেখতে পাবে তাকে? সামসের শুনলে মসিনার বিয়ে হ'য়ে গেছে। মসিনার মাও নাকি আর ইহজগতে নেই। সামসেরের কান্না ফুরিয়ে গেল। আর কাঁদলেনা সে। ভাবলে মসিনার মা না ম'রে মসিনা ম'রে গেল না কেন? বিয়ের কথা শুনে সে 'বিষ' গাছের শেকড় তুলে খায়নি কেন? এই কি মসিনার উপযুক্ত কাজ হ'য়েছে! শেষে সে ভূপালকে বিয়ে করলে—জন্মের মত ভুলে গেল তার দাজুকে?

কেন ভুলবে না—তুমি তার কে সামসের? তাও ভাবলে সামসের—তাইত আমি তার কে? 'দাজু' ব'লে ভালবাসত, আমি তাকে ছোট বোনের মত ভালবাসতুম; এখনও হয়ত সে 'দাজু' ব'লে ভালবাসে। দুঃখ কিসের, হিংসা কিসের? কিন্তু মসিনার বাবা—সামসেরের সর্ব্বনাশের মূলে মসিনার বাবা। মসিনা কি তাই ব'লে তাকে ভুলে গেছে? নিশ্চয়ই না। আর থাকতে পারলে না সামসের—তার ভাঙ্গা টিনের ঘরটি ছেড়ে বেরুল সে। উঠে পড়ল—কিন্তু যাবে কি ক'রে? গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল—বাইরের খবর কিছুই জানত না। এযে দারুণ জল ঝড়!

সেই রাত্রে সেই পাহাড়ে দুর্য্যোগে, সেই দারুণ জল ঝড়ের মাঝে বেরুল সামসের। কি ভয়ঙ্কর সে রাত্রি—গভীর অন্ধকার—থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে—গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে

সেপাই-ঝোরা

পাহাড়গুলো যেন ভেঙ্গে পড়তে চায়। কি গভীর গর্জ্জন সে—কিন্তু সামসেরের সে গর্জ্জন আর কানে বাজে না। অপলক নেত্রে সে দূরের পানে চেয়ে চেয়ে বন্দুকটা হাতে ক'রে পাগলের মত ছুটে চলেছে। পাথর 'ঢোঙা' ত ছার—বড় বড় গাছপালাকেও গ্রাহ্য নেই তার। টুঙ্ থেকে বরাবর মসিনাদের বাড়ীর পানে চল্‌ল সে—সেই পুরাণ পরিচিত পথ ধ'রে, অতি পরিচিত বনের ভেতর দিয়ে। এ জল ঝড় ত তার আজকের নয়। তাই তুচ্ছ তার কাছে, জীবনের ঝঞ্ঝাবাতের কাছে এ জল ঝড় অতি তুচ্ছ।

সেপাইীর পোষাক প'রে চলেছে সামসের বুঝি আর এক রণজয় করতে। কাঁধে বন্দুক—তাই এক হাতে ধ'রে আছে; আবশ্যক নেই বলে বাম হাত তার অনেক দিন অবসর গ্রহণ করেছে। চোখ যেন জ্বলছে। সামসের,—সেই চার বছর আগেকার সামসের ব'লে ত তাকে চেনবার জো নেই। দেখ্‌লে যেন তাকে ভয় হয়। কার উদ্দেশে সে ছুটে চলেছে। বুঝি আবার যুদ্ধ ক'রে মসিনার উপযুক্ত কে তার মীমাংসা করতেই সামসের ছুটে চলেছে। না তার অতি পরিচিত—উভয়ের শৈশব স্মৃতি চিরদিনের জন্য বহন ক'রে যে ঝরণা আজও ব'হে চলেছে, তারই নামকরণ করতে চলেছে সামসের? শেষ খেলা একবার খেল্‌বে 'সেপাই সামসের' আর 'মসিনা' সেই ঝরণার বুকে—শেষ বিদায় নেবে 'সেপাই' তার 'কাঞ্ছির' কাছে তাই চলেছে সেই ঝোরার বুকে নৃত্য করতে আর একবার—যে ঝোরাকে লোকে বল্‌বে—এই সেই "সেপাই ঝোরা!"

* * * *

সেও একটা দিন যে দিন সামসের যুদ্ধে যায়। সে দিনও ঐ পাহাড়ের গায়ে সমস্ত দিন পরে সূর্য্য ডুব দিয়েছিলেন। সমস্ত দিনের কাজ কর্ম্ম সেরে ম্লান হাসি হেসে অবেলায় সূর্য্যদেব লোকের কাছে বিদায় নিয়ে যান। আর সামসের বড় বিশ্বাস রেখে, মসিনার ওপর অনেকটা বিশ্বাস রেখে বিদায় নিয়ে গেছল··· উদ্দেশে মসিনার কাছে। আর আজ—আজ সামসের এসেছে, যুদ্ধ ক'রে ফিরে এসেছে। বাম হস্ত তার দেশের জন্যে দিয়ে এসেছে—তবু ফিরে এসেছে।

মসিনা শুনেছে—'দাজু' তার ফিরে এসেছে, বড় সাধ তার একবার গিয়ে দেখে আসে। দাজু তার কত পয়সা নিয়ে ফিরে এসেছে যুদ্ধ থেকে—নেপালের রাজা তাকে কি পুরস্কার দিয়েছে তাই দেখ্‌তে তার বড় সাধ; কি ক'রে মিটবে সে সাধ। একবার না হয় দেখে আসি—টুঙে দাজুদের সে ঘরটাতো চেনে সে—একবার দেখে এলে হয় ত। কিন্তু সে ঘরে আছে ত—ঘরে না থাকে যদি? না—এ দুর্য্যোগে কোথায় বেরুবে সে? নিশ্চয়ই ঘরে থাক্‌বে। নেপাল থেকে ফিরে এসেছে, একটু বিশ্রামও ত নেবে। আজ আর বেরুবে না। মসিনা ভাব্‌লে আজ রাত্রেই সে গিয়ে সামসেরের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বে। আজকের এ জল ঝড়ে তাকেও কেউ দেখ্‌তে পাবে না—সামসেরও নিশ্চয় ঘরে থাক্‌বে।

কিন্তু দেখ্‌তে পায় যদি কেউ? বাবু দেখ্‌লে ত এবারে—

না, বাবু এ দুর্য্যোগের দিনে বেরুবে কোথা ! ভূপাল—সেও খুব ঘুমায়, আজই ঠিক দিন—যাব গিয়ে দেখে ফিরে আসব। এইটুকু ত পথ—যাওয়া আর আসা। সে দিনও ত রাত্রে গিয়ে রাত্রেই ফিরে এসেছি, কেউ জানতে পারেনি ; কালই ত, কালই নেপাল যাব ব'লে দৌড়েছিলুম। উঃ—ভাগ্যে যাইনি !

কুল কুল ক'রে ঘামতে লাগল মসিনা।

৭

গভীর রাত্রে যখন মসিনা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তখন তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে। জলঝড় থামেনি তখনও—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বরাবর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল মসিনা—চতুর্দ্দিক অন্ধকার। আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলে, তারপর? তারপর যে দিকে ফিরে চায় সেই দিকেই অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার। জমাট্—আরও জমাট্ হ'য়ে আঁধার যেন তার পানে এগিয়ে আসে। মসিনা ভয় পেলে; ভাব্‌লে কি ক'রে যাব এ অন্ধকারে এত জল ঝড়ের মাঝে?

মসিনা চল্‌তে লাগ্‌ল, ধীরে ধীরে সে তার বাপের বাড়ীর দিকে চল্‌তে লাগ্‌ল; কেন কে জানে? এই অন্ধকারে যা কিছু দেখা যায় তারই দিকে ঘনঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চল্‌তে লাগ্‌ল মসিনা। কেউ কোথাও নেই; কেউ তাকে দেখ্‌তে পায়নি। বাপের বাড়ীর কাছে গিয়ে মসিনা দরজার পাশে ব'সে পড়্‌ল। কেউ নেই, কারুর কথাই শুন্‌তে পাওয়া যায় না।

বাপও তার খুব ঘুমিয়েছে, বয়স হয়েছে তার। এ জলঝড়ে কোথায় বেরুবে।

বাপের বাড়ীর আশেপাশে বেশ ক'রে খুঁড়িয়ে দেখে নিলে মসিনা; কারুকেই দেখা যায় না; কথাও কই কারুর শোনা যায় না। দরজার পাশে এসে আবার ব'সে পড়ল; সামনের ছাউনিটায় খানিকটা জল আটকায়, তারই তলায় ব'সে পড়ল। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগ্‌ল সে—সামসের এখন কোথায়; ঘরে আছে কি? যে দুচার দণ্ড আমায় না দেখ্‌তে পেলেই বাঁশীতে ফুঁ দিত, বাঁশীর ডাকেও না গেলে আমি, তার চোখে ঝর ঝর ধারে জল গড়িয়ে পড়্‌ত সেই সামসের চার পাঁচ বছর কি ক'রে ছিল—আমি যেমন ক'রে ছিলুম? এই নিদারুণ যন্ত্রণার মাঝে ফেলে আমায় কোথাও গিয়ে শান্তি পেয়েছে কি? নেপাল গিয়েও না নিশ্চয়। আমিও ত পাইনি শান্তি। আজ কত দিন—কত দিনের পর শত মূর্ত্তিময়ী বিশ্বাসঘাতিনী স্মৃতির নীরব মহামন্ত্রময় বাঁশীর সুরে ভুলে, সেই গম্ভীর সুর শুন্‌তে শুন্‌তে আবার কোথায় যাই? কোথাকার পথে বেরিয়ে কোথায় বা এলুম পথ ভুলে—আবার সেই দুদণ্ডস্থায়ী অতীত সুখের অবসান, যেথায় তারে শেষ বিদায় দিয়েছিলুম বুঝি, সেই ঝোরার পাশে। দিবসের কর্ম্মে দিনের চিন্তায় শ্রান্ত, বিবসনা সন্ধ্যার সেই স্নিগ্ধ শান্তিপ্রদ ছায়া ভুলে—এ দারুণ স্তব্ধতার, এ গভীর রাত্রের ঘোর আঁধারের শিথিল ক্রোড়ে ব'সে—এই জলঝড় উপেক্ষা ক'রে কি ভাবি আমি? চিরদিনের চিন্তা যে, জীবনের পরপার পর্য্যন্ত যে

ভাবনার কোমল হস্ত হ'তে নিষ্কৃতি নেই—আমার সেই চিন্তা, সেই ভাবনা? সামসের—"দাজু" আজ কোথা তুই? আয়না—এ রাত্রে কি ক'রে যাব আমি তোর কাছে। আয়না দাজু—আয়।

হঠাৎ গুড় গুড় ক'রে মেঘ ডেকে উঠ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ল। মসিনার চিন্তা সে আলোয় বাধা পেলে—দূরে দেখ্‌লে সে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি! কি ভীষণ—এই রাত্রে? আমারও মত অবস্থা বুঝি ওরও এই গভীর রাত্রে। এ অন্ধকারে এ মনুষ্যমূর্ত্তি কে? সামসের? তবে কি কানে তার পঁহুছল ডাক আমার? না—না; সামসের কি?

আর ভাবা হ'ল না মসিনার; দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল সে। মূর্ত্তি এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। ভয়ে পাষাণ মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে মসিনা দাঁড়িয়ে প'ড়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল। বড় ভয় হ'ল তার।

* * * *

সামসেরও বেরিয়েছিল—চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌ছে সে। কোথায় দেখতে পাব তাকে; এ রাত্রে তাকে দেখ্‌তে পাব কি? সে মসিনা আর আছে কি; আমার আর নেই সে—কত কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে, মসিনার পুরাণ কথা, উভয়ের অতীত দিনের স্মৃতি ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌তে লাগ্‌ল সামসের। ভূপালদের নূতন ঘরটা চিন্‌ত না সামসের; মসিনাদের ঘরের দিকেই চল্‌ছিল সে, গাছ নড়লে মনে হয় তার—ঐ মসিনা ছুটল। জীবজন্তু

আওয়াজ করলে ভাবে,—ঐ কথা কইছে মসিনা। সবই মসিনাময় সবই মসিনার স্মৃতি। এমন সময় সামসের দেখ্‌লে মেঘের মিটি আলোয়, মসিনাদের দরজা থেকে কে সরে গেল। আবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে সামসের—রাস্তা দিয়ে সামসেরকে দেখ্‌তে পেয়েই কি সে অন্যপথে গেল? না' ঐ যে সামনেই ঝোরার পাশেই দাঁড়িয়ে। কত সন্দেহের স্বরে গম্ভীরভাবে ডাক্‌লে সামসের—"মসিনা?"

অনেকদিন শোনেনি মসিনা সে কণ্ঠস্বর। তারই নাম ধ'রে ডাক্‌লে, শুনে বড় ভয় পেলে মসিনা। ভাব্‌লে কেউ বুঝি দেখ্‌তে পেলে তাকে—ঝরণা বেয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল মসিনা। সামসের ভাব্‌লে—এ নাম ধ'রে ডাক্‌তেই ছুট্‌ছে কেন? তবে কি মসিনাই না কি? পাছু পাছু ছুট্‌তে লাগ্‌ল সামসেরও। অধিকতর ভীত হ'য়ে মসিনা ছুট্‌তে লাগ্‌ল—আবার সেই নাম—'মসিনা'। ছোট্‌ ছোট্‌! আবার ডাকলে সামসের—'মসিনা'?

থম্‌কে দাঁড়াল মসিনা; ডাক্‌ শুনে ভাব্‌লে—কিন্তু সামসের নয় ত? যদি সেই হয়; তার কিন্তু ওরকম চেহারা নয় ত। গলার আওয়াজ যেন মোটামোটা; কি রকম গম্ভীর স্বর; একি সেই সামসের? সেপাই সেপাই চেহারা, ঠিক ত সামসের ত নেপালে সেপাই হ'য়েছিল—ঠিক কথা। এ সামসের নিশ্চয়—ভয় কি? এ যে দাজু—যাকে খুঁজতে বেরিয়েছি এ যে সেই! মসিনা একটু স্থির হ'ল, আস্তে আস্তে ঝরণা বেয়ে, এই পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত পথ বেয়ে জলপ্রপাতের ধার দিয়ে

অতি ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌ল মসিনা—পিছনেই আবার সেই স্বর—

"কাঞ্চি!"

"দাজু!"

"এ রাত্রে কোথা যাচ্ছিলি; কোথায় কার বাড়ী ছুট্‌ছিলি এ দারুণ অন্ধকারে; এই জলে এই ঝড়ে"?

"তোরই পানে দাজু!"

"এঁ্যা?"

"তোকে দেখ্‌তে।"

কুল কুল ক'রে ঘাম্‌ছিল মসিনা। মাথা তার ঝিম্ ঝিম্ করছিল; দেহেও ছিল না কিছু। ধীরে চল্‌ছিল সে. তবুও পা হড়্‌কে পিচ্ছিল পাথরে আছাড় খেয়ে পড়্‌ল মসিনা; পা টলে পড়্‌ল, মাথা টলে পড়্‌ল। ততক্ষণে সামসের তাকে ধ'রে ফেলেছে; কিন্তু মসিনা পা পিছ্‌লে পড়ার আগে তার দেহ—ক্ষীণ কঙ্কালসার দেহখানি ভূমিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। টলে পড়ার ঝোঁকেই সে পাথরে পা ফেলেছিল; অমনি প'ড়ে গেল—সামসের তার মূর্চ্ছিত দেহখানি, মসিনার মূর্চ্ছিত, অবশ শ্রান্ত দেহখানি বক্ষে ক'রে ব'সে পড়্‌ল সেই বড় পাথরের ওপর।

বহুদিন পরে ঝোরার 'পরে সামসের আর মসিনা।

ভোর হ'তে বেশী ও ছিল না। জল খেমে গেছে, ঝড় থামেনি। আকাশ অনেক পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, ঝড়ের হাওয়া হু হু ক'রে বইছে তখনও। দারুণ শীত—শীতের হাওয়া হাহুতাশ ক'রে পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ঝরণার মূর্ত্তি কি ভীষণ! হুস্ হুস্ ক'রে জলের বোঝা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে বড় বড় পাথর ঠেলে নিয়ে চলেছে। তারই মাঝে সেই পুরাতন অতি পুরাতন শৈশবের স্মৃতি মাখানো তাদের সেই বড় পাথরটার ওপর ব'সে আছে সামসের মসিনার মূর্চ্ছিত দেহখানি কোলে নিয়ে—একদৃষ্টে চেয়ে মসিনার পানে পাথরের মূর্ত্তির মত। নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে আছে সে তার আদরের মসিনার পানে কিন্তু আর বাঁচ্বে কি সে? কি সুখেই নিদ্রা যাচ্ছে মসিনা, হাসিমুখে, সামসেরের কোলে তার অবশ মাথাটী রেখে!

ভূপালদের বাড়ী গোল বেধে গেল। মসিনার বাপের বাড়ী খবর হ'ল। সেখানেও নেই মসিনা। তার বাবুও বেরুল; খুঁজে পাওয়া গেলনা কোন বাড়ীতেই তাকে। দু'একজন

ঝরণার ধারে সে অন্ধকারে দেখেও তাদের, সন্দেহ করতে পারেনি—যে মসিনা আছে সেথায়। ভোরের আলোর সঙ্গে মসিনার বাবু দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়েছিল। সব বুঝতে পারলে সে, কিন্তু সেও কাছে আস্‌তে সাহস করলে না, আজকের ঝোরার মূর্ত্তি দেখে! আর দেখে সামসেরের প্রচণ্ডমূর্ত্তি! তার এক হাত নেই—অপর হাতে মস্ত এক বন্দুক!

ধীরে ধীরে সামসের উঠে পড়্‌ল। মসিনার গভীর নিদ্রা-কাতর দেহখানি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ঝরণা বেয়ে উঠে পালিয়ে গেল সামসের। লোকে সেই থেকে "সেপাই-সামসেরের" রুদ্রমূর্ত্তির সাথে তুলনা দিয়ে সেই ঝরণাকে ডাক্‌ত "সেপাই-ঝোরা" বলে। মসিনার বাবু তার মেয়ের স্মৃতি রক্ষা করার নামে সামসেরকেও ভুল্‌লেনা আর। সেও সেই ঝোরাকে বল্‌ত—সেই "সেপাই ঝোরা!" পথিক পথ চল্‌তে সাথীকে বল্‌ত এরই নাম "সেপাই ঝোরা"। আজও যারা যায় সেথা চিন্‌বে দেখে সেই—"সেপাই ঝোরা"। অতীত স্মৃতি বুকে ক'রে ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে তার তক্‌তকে তর্‌তরে জল এলিয়ে দিয়ে ছুট্‌ছে দেখ্‌বে 'সেপাই ঝোরা'।

সামসের ত গেল। রোদ ওঠার সাথে সে অনেক চেষ্টা করেছিল মসিনাকে বাঁচাবার। কিন্তু শত ওষধি, তার শত ক্রন্দন, শত আহ্বানও সে ছিন্ন লতাকে বাঁচাতে পারেনি। একবার

কিছুক্ষণের জন্যে ভোরের আলোয় মসিনার মূর্চ্ছা ভেঙেছিল, কিন্তু সেই শেষ। সেই তার শেষ দেখা দাজুকে তার। সেই মসিনার শেষ কথা কওয়া তার দাজুর সাথে। কোদের হাসিখেলির মাঝে একবার মসিনা চেয়েছিল; সামসেরের হাতে তখনও 'ওষধি'—গাছের পাতা ছিল অনেকগুলো। নিঙড়ে সে মসিনার মুখে আরও একটু রস ঢেলে দিলে। ডাকলে—

'কাঞ্চি'!

ধীরে ধীরে চোখ খুলতেই আরও দু'চার ফোঁটা রস তার ওষ্ঠাধরের মধ্যে দিয়ে দিলে সামসের। অধরে মসিনার হাসি ফুটে উঠল। আবার ডাকলে সামসের—

"কাঞ্চি!"

"দাজু—" অতি কষ্টে সাড়া দিলে মসিনা—"দা—জু"—

"কি কষ্ট হচ্ছে?"

"কিছু না। আমায় কোথা আনলি দাজু?—কোথায় ছিলুম?"

"ঝরণার ওপর সেই পাথরটায় ছিলি মসিনা। যেখানে ছেলে-বেলায় বাগানে জল দিয়ে এসে বসে থাকতুম দু'জনে—এইখানেই শেষ ছাড়াছাড়ি হয়—আমরা যখন উড়ে যাই—মনে নেই?"

"হুঁ—" ছোট্ট একটী 'হুঁ' বলার সাথে ঘাড় নেড়ে জানালে মসিনা যে 'আছে'। সব কথাই যে তার প্রাণের ভেতর উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলছে, মনে থাকবে না? অতি ধীরে বললে মসিনা—

"নেপালে একা গেলি দাজু। এবার কোথাও যাস্‌নে—নয়ত আমায় নিয়ে যাস্। যাবি দাজু—যাবি" ?

"যাবো"—তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌লে সামসের—"যাব কাঞ্চি যাব।"

ক্ষীণ কণ্ঠে মসিনা বল্‌লে—'চলো'। পরক্ষণেই বড় জোরে একবার নড়ে উঠ্‌ল মসিনা ; আধবোজা চোখ দুটো যেন নিমেষের জন্যে জ্বলে উঠ্‌ল বল্‌লে—বড় ক্ষীণ কণ্ঠে, কিন্তু বেশ তীব্র বলে মনে হ'ল—

"না দাজু ছেড়ে দে, আমি যে ভূপালের—ছে—ড়ে দে—দাজু, আমায় ছে— , · · ।"

চিরদিনের মত সব চেষ্টা সামসেরের ব্যর্থ ক'রে দিয়ে নীরব চাহনি চেয়ে রইল মসিনা—সে চাহনি বড় ভীষণ! যেন আবেগ-ভরে কি বল্‌তে চায়! দীনহীন সামসের সেই হিমাঙ্গ মসিনার পানে কতবার চেয়ে ডেকেছে, "মসিনা—বোনটী"। সে দেহ বুকে চেপে ধ'রে ডেকেছে—"কাঞ্চি"—কোন সাড়া আর কেউ দেয়নি !

*　　*　　*　　*

এখনও টুঙ্ যাবার পথে 'সেপাই ঝোরায়' গাড়ী দাঁড়ালে মনে হয়—দূর হ'তে একটা পাহাড়ী সুর একটা করুণ মূর্চ্ছনা নিয়ে সে দিনকার সেই ভীষণমূর্ত্তী দুর্দ্দমনীয় ধারণাটাকে আজ বড় শান্ত ক'রে তার ঝুর্ ঝুর্ ক'রে ঝরে পড়ার সাথে দীন ক্ষীণ সুরে ভেসে আস্‌ছে—

"মইলায় একলাই ছোড়ি গয়ি গয়ো,
—গয়ো মেয়ো কাঞ্চি।"

দীক্ষা

বিপত্নীক রাধা পণ্ডিতের একটী মেয়ে মেখলা—গোবিন্দের স্ত্রী। পূর্ণ-যৌবনা মেখলা তখন বাপের ঘরে; তার সাধের স্বামীর ঘরে হাতে তৈরী সখের ফুলবাগান অযত্নে বুঝি শুকিয়ে গেল। স্বামীর ঘরে সে সখ করে ফুল বাগান করেছিল—শিবপূজার ফুল চাই যে! কিন্তু মেখলা আজ তার বাপের কাছে; তার ফুল বাগানে ত জল দেওয়া হ'বে না। জল পড়লেও আগাছা তুলবে কে—গোবিন্দ?

কত সুখের চিন্তায় বিভোর হ'য়ে মেখলা উঠানে বসে এই সব ভাবনা ভাব্‌ছিল; সে যখন চলে আসে তখন তার সে সাধের ফুলবাগানে বকুলগাছে ফুল ফুটতে সুরু হয়েছে; যুঁই গাছগুলো পুকুরের চারিধার বেড়ে রেখে কুন্দের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধছিল; তার সাথে ঝগড়া কর্‌বে—কার গন্ধ ভাল? তার ছোট বাগান-খানি তখন সাদা সাদা ফুলে মাথা ঢেকে তাকে বলেছিল—'মেখলা, তুমি যাও বাপের বাড়ী; এ ফুলের গন্ধ আর কারুকে দেব না, তুমি কিন্তু এসো শীগ্‌গির।' আর ফুরেফুরে হাওয়া—

স্বভাবের ছিঁচ্‌কে চোর—আড়াল থেকে আড়ে চেয়ে ব'লে গেল—'ওগো, লুকোবে কোথা? তোমার ঢাকা দেওয়া সাদা চাদরের ফাঁক থেকে সব ফুলের সুবাসটুকু চুরি ক'রে পালিয়ে যাব, কেউ দেখতে পাবে না।'

মেখলা যেন বাতাসেরই সখি। তা নাহ'লে এখানে বসে সে বকুলের গন্ধ পায় কোথা হ'তে? একি তার 'সখের ফুলবাগানের' বকুল-গন্ধ তাকে এনে দিয়ে গেল? হবেও বা; না তার মনের ভুল? তাও ত বটে; কোথায় তার শ্বশুর-বাড়ী, ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়ালে তার ছোট্ট বাগানখানি—আর কোথায় সে ব'সে, তার বাপের বাড়ীর উঠানে, মাঠের মাঝে টোলবাড়ীতে! রাধা পণ্ডিতের হাতে গড়া ছাত্র গোবিন্দ মেখলার স্বামী, কত ছোট বয়স থেকে সে গোবিন্দকে চেনে!

আশ্বিনের প্রথমেই সে বাপের ঘরে এসেছে; সে জানে বর্ষা ফুরিয়েছে, এবার পূজার ক'টাদিন সে বাপের বাড়ীতে কত আমোদে কাটাবে। শরতের মলয় পরশ অনুভব ক'রে সে 'আগমনীর' সুর ভাঁজছিল। কিন্তু তার ভাবনার স্রোত বাধা পেলে। পশ্চিমদিকে নিবিড় কালো মেঘ জমাট বেঁধে তার মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়ল—তাকে অস্থির ক'রে দিয়ে একটা কাল্-পেঁচা ডেকে গেল—ওঃ, এ যা মেঘ, যদি জল হয়; তাহ'লে ত সব ভেসে যাবে! আর তার ফুলবাগান? গোবিন্দ রক্ষা করতে পারবে? সে যত্ন নেবে কি?

তখনও মেঘের ফাঁকে সূর্য্য উঁকি দিচ্ছেন; মেখলার সুন্দর

সেপাই-ঝোরা

মুখখানাকে লাল ক'রে দিয়ে সূর্য্যের রক্তমাখা আভাগুলো সেই নীল আকাশটাকেই 'ফাগে' মাখিয়ে রেখেছিল—হঠাৎ সিঁদুরে মেঘগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে কালো মেঘের এক ছল! একে একে সব আকাশটাই জুড়ে বস্‌ল —কালো জমাট মেঘ! কত বাদলবেলা মেখলার কেটে গেছে একা একা। কত বর্ষার দিন কেটেছে তার গোবিন্দের সাথে; কিন্তু এমন মেঘ সে ত কখনও দেখেনি। কাল—নিবিড় কাল মেঘের রাশি! যেন দারুণ বিষাদের স্পর্শ সব আকাশটা ঘিরে নিলে—আর সেই বিষাদের ছায়া যেন আকাশ বাতাস ভেদ ক'রে দূরে অদূরে ছড়িয়ে গেল। ব্যাকুল প্রাণে চেয়ে দেখলে মেখলা—উঠানময় অন্ধকার; চতুর্দ্দিকেই ঘন কাল মেঘ! কি ভয়ানক বৃষ্টিই নাম্‌বে—পদ্মা কি উব্‌ছে উঠবে না? বন্যা হয় যদি!

মেখলা উঠান ছেড়ে ঘরে গেল—কিন্তু তার মন বড় আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল! তাদের বড় চালাখানা এ জলে কি থাকবে? টোল-ঘরের চালাটা যে অনেক পুরাণ।

* * * *

সে দিন সন্ধ্যায় যে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল সে আর থামল না। তিন দিন অক্লান্ত বর্ষণেও তার আশা মিটে না—বন্যার পূর্ব্ব সূচনা। শরৎ-শশী লুকিয়ে পড়ল। দেবীর নৌকায় আগমন। চতুর্দ্দিক জলে জলময়—সাদা চাদরে মাঠঘাট বিছান হল; এখনও ঝম্ ঝম্, ঝিম্ ঝিম্।

২

ছোট একটী একতলা কোঠা বাড়ী; ভাঙ্গা পাঁচিল আশে পাশে দু'দশহাত ঘেরে রেখে তার পূর্ব্ব অস্তিত্বের পরিচয় দিয়ে চলেছে—বাড়ীখানির অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। কোথাও ভাঙ্গা জানালা, কোথাও ভাঙ্গা দেওয়াল অপরিচিতের পথে বাধা দিতে বুক পেতে প'ড়ে আছে; আবার কোথাও বা গাছের ভাঙ্গা ডাল বর্ষার ভরা বুকে গাভাসান দিয়ে হাওয়ায় দুলে দুলে গায়ক পাখীর দলকে বলে 'উড়ে যা উড়ে যা'—বাতাসকে ডেকে বলে—'দে দোল, দে দোল।' বকুল গাছটা তখনও হেলে প'ড়ে বাড়ীর দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—ঝড়ে 'ঝড়াটে' মেরে; যাথী যুথী, কুন্দ করবীর চিহ্নটিও নেই।

এ বর্ষায় কেউ রক্ষা পায়নি—বন্যায় গ্রাম উজাড় হ'য়ে গেল, গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে দিয়ে বন্যার জল ঢেউ খেলিয়ে চলে গেল; কিন্তু এ ছোট বাড়ীখানিকে স্রোতের টানে নিয়ে যেতে পারেনি, ভারি শক্ত ভিত। পাকা ঘরখানা তখনও মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

সেপাই-ঝোরা

মেটে প্রদীপ—শক্তি নেই তবু প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে ঘরটিকে আলো ক'রে রেখেছে। জল তখন সরে গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগেই দুর্য্যোগ কেটে গেছে—জল সে গ্রামের মেটে দোচালা সব বুকে ক'রে নিয়ে গিয়ে নির্জ্জন, নিরালায় তাদের বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে—কিন্তু এই ভাঙ্গা শত বৎসরের পুরাণ ঘরখানিকে রেখে গেছে—গুরুদেবকে দারুণ অপঘাত মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা কর্‌তে।

গৃহের অধিকারী শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য শত ব্রাহ্মণসন্তানের গুরুদেব। ষাট বৎসরের বৃদ্ধ সুস্থ সবল দেহে শিষ্যগৃহে পদধূলি বিতরণে বাহির হ'তেন কত ঘাট মাঠ পথ অতিক্রম ক'রে; কিন্তু আজ অনাহারে অনিয়মে তিনি শয্যাশায়ী—কয়দিনে জীর্ণশীর্ণ; দারুণ দুর্ভিক্ষে ক্ষীণ। বৃদ্ধা স্ত্রী অসুস্থ স্বামীর পদতলে উপবিষ্টা। সারা গ্রাম নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। অন্ধকার—দুর্ভিক্ষের কালো স্পর্শের সাথে মিশে গিয়ে নিদারুণ আঁধারের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে এ জেলা হ'তে ও জেলা।

প্রদীপে তৈলাভাব; মিট্ মিট্ ক'রে তবুও সে জ্বল্‌ছে; গৃহের কয়টী প্রাণীর প্রাণবায়ুও অতি ধীরে ব'য়ে চলেছে। গুরুদেবের পুণ্য—স্বামীস্ত্রী জীবিত, রোয়াকে উপবাসী গাভী অন্যমনে শায়িত। ঘরে অন্ন নেই, অভুক্ত গাভীর স্তনে দুধ নেই। আর কয়দিন এমন ভাবে চলে? উপবাসী বৃদ্ধা স্ত্রী এক ছটাক দুধ কোনরূপে সংগ্রহ ক'রে ভিজা পাতার জ্বালে গরম ক'রে স্বামীকে বল্লেন—"একটু খাও।" স্বামী অতি কষ্টে চোখ চেয়ে বল্লেন—"তুমি খেলে?"

"তুমি খেয়ে নাও। গোবু বাড়ী নেই, সে এলে খাব'খন শুন্‌ছ?"

"হ্যাঁ; তুমি যে আজ চারদিন নির্জলা উপোস—"

"তা হোক্—তুমি খেয়ে নাও; আমায় একটু পায়ের ধুলো দাও। তাই আমার ঢের।"

একটী ছেলে গোবিন্দ জল ঝড়ের আগে বাহিরে গেছে এখনও ফেরে নি। তাই এই বর্ষা নেমে থেকে বৃদ্ধা গুরুপত্নীর নিষ্প্রভ চোখেও বর্ষা নেমেছে—তিনটী দিন পুত্র গোবিন্দের জন্য অবিশ্রান্ত ক্রন্দন। বাহিরে অফুরন্ত ঝড়জল—ঘরে বৃদ্ধার চোখে জল, আর প্রাণের ভিতরের তুমুল ঝড় তখনও গোবিন্দকে ফিরিয়ে আন্‌তে সক্ষম হয়নি। বৃদ্ধা কাঁদেন আর ভাবেন—মেখলা কোথায় এ ঝড়ে? সে যে তাঁর সোণার প্রতিমা! খুট্ ক'রে শব্দ হ'লে মনে হয় ঐ 'গোবু' এল; দুয়ারে নির্জীব গাভী ডাক্‌লে মনে হয় ঐ 'গোবু' এল। ঘুমন্ত পাখীর ছানা ঝড়ে কোথা লুটিয়ে পড়েছে দেখে—সেথাকার শাবকহারা বিহগীদের করুণস্বরে মনে হয় তাঁর, ক্ষীণকণ্ঠে ডাক্‌ছে তাঁকে মাতৃহীনা মেখলা—'মা আমার'।

* * * *

মেখলার বাপের ঘর মাটীর। মস্ত বড় 'আটচালাখানি' ছিল রাধা পণ্ডিতের টোলবাড়ী। তারই পাছে দুই একখানি মাটীর ঘর। এ বর্ষা সেই মাটীর ঘরকে ধুয়ে ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে কেউ জানে না। যেখানে বিশ বৎসরের টোলবাড়ী

খুঁটীর ভর ক'রে এতদিন দাঁড়িয়েছিল 'খড়ে-ছাওয়া' মাথাটী উঁচু ক'রে, আজ সেখানে থৈ থৈ জল। জলদের উপমাহীন জললীলা আর পদ্মার বুক-ভরা জলে নিষ্ঠুর স্রোতভঙ্গি। বন্যা সেখানকার শেষ খুঁটীটুকুও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; কত জীব, কত জন্তু, কত শত অভাগা গ্রামবাসীকে স্রোতে টেনে নিয়ে গেছে। মেখলাকেও বাদ দেয় নি বন্যা—রাধা পণ্ডিতকেও নয়!

কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ভেসে গেল পিতা তার। বৃদ্ধ পিতার গলা জড়িয়ে ধ'রে স্রোতের মুখে পড়ে গেল মেখলা—কেউ জানে না বৃদ্ধ রাধা পণ্ডিতের পিতৃস্নেহের বজ্রকঠোর বাহুবেষ্টন কিসের স্পর্শে শিথিল হ'য়ে কখন তাঁর প্রাণপুতলি মেখলার অঙ্ক থেকে সরে গেছে। কেউ জানে না কখন অবশ হাতদু'খানি মেখলার বাপের গলা ছেড়ে দিয়ে স্রোতের জল আঁকড়ে ধ'রে ঢলে ঢলে পড়েছিল। বন্যা বৃদ্ধের ক্ষীণ জীবনরেখাটুকু মুছে নিয়ে কোথায় কোন্ অতলে ফেললে দিলে—তাও কেউ জানে না!

আর মেখলা? জানেনা সে তার স্নেহের পিতা কোথায়—কোথায় সে নিজে আর কি অঘটন ঘটে গেল তাঁর। কেমন ক'রে বাঁচল সে? দীনু কে? শুনেছে বন্যার মুখ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছে তাকে দীনু, কিন্তু দীনুকে সে ত চেনে না! চেহারা দেখে দীনুর ভয় হয় মেখলার, কিন্তু স্বর ত তার তেমন নয়। দীনু তাকে 'মা' ব'লে ডাকে যে! আর ভাবতে পারে না মেখলা। গোবিন্দ কোথায় এ বন্যার মাঝে?

৬

খট্ খট্ খট্ ; খুস্ খুস্ খুস্।

দীনু নস্কর গ্রামের পুরাণ চোর ; দুবার জেল খেটে এসেছে সে ; এ বন্যায় তার ঘরেও চাল নেই। চালাখানাও ভেসে গেছে। একটা পাতার চালা বেঁধে ক'টাদিন রাত কাটাচ্ছে —কিন্তু খাবে কি ? কার বাড়ী চুরি করবে ? সবারই যে সমান অবস্থা ! তার ওপর এ কয়দিন তার 'মা' এসেছে। দীনু সংসারে একা ; কোনরকমে হয়ত চলে যেত ; কিন্তু দুটো প্রাণীর চলে কেমন ক'রে ? বন্যার মুখে ভেসে যাচ্ছিল যে মেয়েটী তাকে তুলে এনে সে কত 'সেকতাপে' বাঁচিয়েছে—কিন্তু এখন খেতে দেবে কি ? তার কচি 'মা'টি যে এখনও উঠে বস্তে পারে না— অনাহারে ফেলে রাখ্‌লে সে বাঁচবে ক'দিন ? যদি রক্ষাই করলে ভগবান্, যদি ছেলের হাতে মাকে তুলে দিলে তবে ছেলের সংস্থান দাও ; এ দুর্ভিক্ষ কেন দিলে ভগবান ? বন্যায় যে কারুর কিছু নেই !

সেপাই-ঝোরা

অনেক ভেবে চিন্তে দীনু আবার তার বড় লাঠিগাছটা বগলে ক'রে ঘোর রাত্রে বেরিয়ে পড়্‌ল—তার 'মা' তখন ঘুমিয়েছে।

*   *   *   *

খট্ খট্ খট্; খুস্ খুস্ খুস্। তস্কর দীনু নস্করের সিঁধ-কাঠি আধ-ভাঙ্গা 'আওয়াজি' খানা খুলে ফেল্লে। পা টিপে ঘরে ঢুকতেই গুরুদেব ডাক্‌লেন—"গোবু, এলি বাবা"।

কোন সাড়া নেই। গুরুপত্নী তন্দ্রার ঘোরে।

"আয় বাবা, তোর মা এখনও কিছু খায়নি গোবু।"

তৈলহীন প্রদীপ আর জ্বলে না, নিভে গেল—ঘর অন্ধকার। নিদ্রিতা পত্নীকে সম্বোধন ক'রে গুরুদেব বল্লেন—

"শুনেছ গোবো এসেছে; আলোটা জ্বালো।"

নিস্তব্ধ, নিঝুম; সাড়া নেই, শব্দ নেই। পাষাণ হৃদয় দীনুর প্রাণ ব্যাকুল, উদ্বেল; চক্ষু সজল!

"ওঠনা, গোবু এসেছে; তোমার কি ঘুম? ওঠ, গোবু এসেছে; কি এনেছে—খাও। ওঠ আলো জ্বালো।"

"এঁ্যা, গোবু এলি, আয় বাবা, এই উঠি।"

ছোট আলোটাতে তখনও একটু তৈল ছিল। দেশলাই খুঁজে গুরুপত্নী অতি কষ্টে আলো জ্বাল্‌লেন। দরজা থেকে সাড়া এল—"মা আমি দীনু।"

"জানি বাবা, আয়।"

"কিছু ত আনিনি মা।"

"তা হোক্, তুই আয়। আয় বাবা বস্।"

বৃদ্ধার নিষ্প্রভ চক্ষু দীনুকে পুত্র বিবেচনায় বাধা দেয়নি। 'দীনু' কি 'গোবু' কোন শব্দই বৃদ্ধার কর্ণে অন্য নয়; বিশেষতঃ এই রাত্রে। সবই 'গোবু'—সব কথাই 'মা আমি এসেছি—আমি গোবু!' এ দারুণ কষ্টের দিনে গোবু যে বড় ভরসা। বৃদ্ধের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ; পুত্রের যে একান্ত প্রয়োজন—পল্লী—না না গ্রাম, গ্রাম যে জনহীন!

* * * *

অপুত্রক, বিপত্নীক তস্কর দীনু এখন তার দেবতা মা বাপের সেবায় যত্নবান; তার দিনে বিশ্রাম নেই—রাত্রে ঘুম নেই। তিনটী প্রাণের আজ সে রক্ষাকর্ত্তা। তার কচি 'মা'টীর ব্যবস্থা দীনু এরই মধ্যে ক'রে এসেছে—তার এক বুড়ী পিসিমার জিম্মায় দীনু তার কুড়িয়ে-পাওয়া 'মা'কে রেখে এসেছে—রোজ সে তার খবর নিয়ে আসত—এমনি ক'রে পাঁচ ছ'দিন কাটিয়ে দিলে দীনু এই দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে।

সেদিন অমাবস্যার ঘোরান্ধকার। জনহীন গ্রামখানি নিস্তব্ধ; বন্যা সরে গেছে। এই ঘোর নিদারুণ অন্ধকারেও হাওয়ার বিশ্রাম নেই—পচা জীবজন্তুর তীব্র গন্ধ সারা পল্লীগ্রামটী মাতোয়ারা ক'রে রেখেছে। যারা মরেছে তারা পচেছে; যারা মরেনি তাদের কেউ শুষছে, কেউ উগ্র পচা গন্ধে দম বন্ধ ক'রে বসে আছে।

দীনু গুরুদেবের রোয়াকে ঠেসান দিয়ে বসে ভগবানের কাজ-কর্ম্মের গূঢ় রহস্য ভেদে আনমনা, এমন সময় শব্দ হ'ল—দুড়্ দুড়্

দুড়্ ধুপ্ ধুপ্ ধাপ্ ধুপ্। দীনু লাঠিগাছটা হাতে ক'রে দুয়ারের পাশে এসে বল্লে—

"খবরদার।"

বাহিরে অস্ফুটধ্বনি—"এ যে দীনু ভেয়ের গলারে!"

"তাই নাকি? হাঁ—না।"

দীনু হাঁক দিলে—"দুলো—দাঁড়া; পালাসনে।"

আবার ফুস্ ফুস্ শব্দ হ'ল—"হাঁরে হাঁ দীনু ভাই।"

"সর্দ্দারজী কি এখানেই ছিল নাকি?"

"হ'বেও বা—আজ চারদিন ত তারে দেখিনি।"

দরজা খুলে দীনু এসে বাইরে দাঁড়ালো—বল্লে—

"দুলো—ওরে রামা আজ থেকে তোরা ডাকাতি ছাড়্ আর কারই বা কি লুঠবি?"

"কেন তুমি কি দীক্ষে টিক্ষে কিছু নিলে নাকি? এ গুরু-ঠাকুরের ভিটেয় দাদা কি দীক্ষে নি—"

"চুপ কর্—দীনুর সামনে দাঁড়িয়ে তার—এই—লাঠির ঘা চিনিস্ নে?"

"এই দাদা—না—তা বলছিলুম।"

হ্যাঁ হ্যাঁ দীক্ষে নিয়েছি।"

"কবে—ক—ক—কবে?"

"সে দিন রাত্রে—দেখ্—তোরা এ বাড়ী আগ্‌লে রাখ্—একটু; আমি আসছি এখনি।"

৪

মাথার উপর জলদের কাল ছাউনি দেখে স্থির থাকতে পারেনি গোবিন্দ। বন্যার বহুপূর্ব্বে ফিরে আসছিল সে শিষ্যবাড়ী থেকে; ছুটে আসছিল সে তার বৃদ্ধ পিতামাতার ক্রোড়ে। পথে দীনুর লোক তাকে আটক ক'রে রেখেছিল, সর্দ্দার দীনুর অপেক্ষায়; গোবিন্দের চাদরের খুঁটে বাঁধা শিষ্যদত্ত 'প্রণামী'-টুকু হস্তগত করতে।

কিন্তু আজ দীনু বুঝতে পারলে কাকে তারা ধ'রে রেখেছে। গোবিন্দ—সে যে তার 'কুড়িয়ে-পাওয়া' মায়ের স্বামী!

সে দিন ভোরের বেলাই দীনুর লোকজন গোবিন্দকে কোথা থেকে খুঁজে নিয়ে এলো। দীনু ইতিমধ্যেই তার কচি 'মা'য়ের পরিচয় পেয়েছিল—আজ সে তার 'মা'কে আনতে ছুটল।

মেখলা যখন শুনলে—গোবিন্দ সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে তখন তার সব কষ্ট ভুলে গেল সে। দীনুর ঘরে কি উদ্বেগেই না দিনগুলো কাটছিল তার; কিন্তু এখন সে সব ভাবনা দূরে সরিয়ে দিলে, সে বন্যার কথা ভুলে গেল, সেই দুর্ভিক্ষের কথা ভুলে গেল—আজ যেন সে যথার্থই পুনর্জীবন ফিরে পেলে। দীনুর ঘরে যেন কি তার নেই, কি যেন চিরদিন ধরে ছিল তা যেন আর নেই। কিন্তু আজ সেই 'নেই নেই' ভাব সরে গিয়ে তার স্থলে পূর্ণ আনন্দকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল।

সব ভাবনা চিন্তার ঢাকা দেওয়া চূড়াগুলো কোথায় আড়াল পড়ে গেল ; সব পুরাণস্মৃতি কোথায় উধাও হ'য়ে গিয়ে নূতনকে নবপ্রেম-ভরে আলিঙ্গন কর্‌বার জন্যে মেখলার চোখের সাম্‌নে ধ'রে দিলে বিহ্বল আকুল আবেগে। আজ তার চোখে সব সুন্দর, শুষ্ক মরুভূমির মত সে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামখানিও অতি সুন্দর, সারা বিশ্বসংসার সুন্দর, সুস্থির—সবাক। অন্তরের আবেগে, বিহ্বল পূর্ণতায় ডাকাত দীনুকেও মেখলা যথার্থ পুত্রত্বে বরণ ক'রে নিলে। দীনু বল্লে, "চল মা তবে—হাঁট্‌তে পারবে ?"

"পারব দীনু, তুমি চল—বেশী দূরও ত নয়।"

আজ এক ক্রোশ পথও মেখলার কাছে খুব কম। সে যখন ধীরে ধীরে গিয়ে গলবস্ত্রে তার শ্বশুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, গোবিন্দ পাশে থেকে অবাক্ হ'য়ে গেল। ক্ষীণ অবশ মস্তকটী তুলে ধ'রে মেখলা গোবিন্দর পানে চাইতেই গোবিন্দ আবেগে কোমল স্বরে ডাক্‌লে—'মেখলা !'

* * * *

চিরদিন বাঙ্‌লার দুর্ভিক্ষপীড়িত, রোগক্লিষ্ট প্রাণীগুলিকে জীবন দিতে যে স্বেচ্ছাসেবীর দল আগুয়ান হয় 'ভিক্ষালব্ধ' অর্থ সঙ্গে ক'রে, আর তাদের 'আলোকরা' প্রাণ আর স্নেহমাখা কণ্ঠ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়ায় তাদের কোমল বাহু প্রসারণ ক'রে—সেই ভিখারী স্বেচ্ছাসেবীদেরই একদল পরক্ষণেই এসে ডাক্‌লে—

"বাড়ীতে কেউ আছেন কি ?"

বাদ্‌ল-বেলা

১

উন্মুক্ত আকাশ, গগণ ভেদ ক'রে তারি মাঝে শুধু বিজলীর হাসি খেলা স্পষ্ট দেখা যায়, আর কিছু নয়; অচলে সচল গর্জ্জন চপলার পাছে পাছে, কান ঝালাপালা ক'রে দিলে। পাহাড়ে বর্ষা নেমেছে, আর থাকা যায় না। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা আরাম কেদারাটায় শুয়ে একটা 'লালিম্‌লি'—কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে গড়্‌গড়ার নলটা মুখে দিয়ে কত কথাই ভাবছিলেন। সব ছিল তাঁর, কিন্তু কেউ নেই—ওই একটা কণামাত্র অবশিষ্ট আছে। আবার গুরুগর্জ্জন; করুগেটেড্‌ টিনের ছাদ—কাঠের ঘরবাড়ী। কি মধুর শব্দ—গানের স্বর যেন ভেসে বেড়ায় বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা সে টিনের ছাদে তীর বেগে ছুটে এসে পড়ার সাথে। বৃদ্ধ বড় রসিক—নাতিকে ডেকে বল্‌লেন—"হারু, আজ কেমন লাগ্‌ছে? আজ যদি তোর বৌ থাকৃত, এই বাদলায় এক ছিলিম তামাক সাজতে বলতুম তাকে; সে তামাক সাজতে

গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেল্‌ত; তুই মনে মনে আমার ওপর রাগ করতিস্, চোখ রাঙাতিস্। আর আমি যখন আদর ক'রে নাতবৌকে আমার বুকে টেনে নিয়ে এই বাদলা দিনটায় তাকে মনের কথা বলতুম, তুই তখন একা ঐ খাটটায় শুয়ে বৃষ্টির ফোঁটা গুন্‌তিস আর বলতিস মনে মনে—বুড়ো কবে যে উদ্ধার দেবে। যাক্ থাকলে কেমন হ'ত বল্‌ত?'

হারু তখন ঠিক কি করছিল মনে পড়ে না। একখানা কি বই খোলা পড়েছিল আর হরেনবাবু চোখ বুজে কি ভাবছিলেন তাও জানি না। মুখটা তুলে তার ঠাকুরদার পানে চেয়ে বল্‌লে "ঠাকুরদার কি আজ ঠাকুরমাকে বড্ড মনে পড়ছে? বাদলা পেলেই বুঝি ঠাকুরমাকে হাত পুড়িয়ে তামাক সাজার আদেশ হ'ত? আহা বেচারাকে কত কষ্ট—"

"আর আদর বুঝি করতুম না? তামাক ত সে আপনি সেজে আন্‌ত রে তাকি আর বল্‌তে হ'ত। কিন্তু আজ একটা নাতবৌ থাক্‌লে বড় সুবিধা হ'ত। আর ভাই কবে আছি কবে নেই। বয়স ত হ'ল রে। মর্ত্ত্যের ভোগের ত বাকী কিছু রইল না, সাধও মিটল সব—আর ত একটাই বাকী ভাই—ঐ ঐটে, একটা বৌ তোর—কেমন হয়?"

হারু প্রাণে বড় ব্যথা পেলে। তার ঠাকুরদা যে তাকে ফেলে তুনিয়া ছেড়ে কোনদিন যেতে পারবেন এ ধারণা তার কোনও দিন ছিল না; ভাববার আবশ্যক ছিল না তার। আজ বড় ক্ষুন্নমনে ব'লে গেল সে—

"কেমন হ'ত—কি থাকলে কেমনটী হয়, এ বোধশক্তি আমার নেই ঠাকুরদা, তবে বড় সুখ পেতুম বড় আনন্দে থাক্‌তুম্ আজ যদি সবাই থাক্‌তেন আর থাক্‌তেন ঠাকুমা— ।"

"হারু, তোর ঠাকুমা ? বটে—"

"তুমি ত আধখানা দাদু, এর ওপর আর আধখানা থাক্‌লে কেমনটী হ'ত বড় সাধ হয় দেখতে। কিন্তু আর ত— যাক্‌গে সে কথা; সে গল্প, গল্পই থাক্। ঠাকুমা তোমায় বড় ভাল বাস্‌ত— নয় ঠাকুরদাদা ?"

"ওরে বাস্‌ত রে বাস্‌ত। ক'দিনই বা বেসেছে ? পাঁচ বছর —মোটে পাঁচ বছর। বলেছি ত ভাই, তখন বি, এ পড়তুম, সতের বছর বয়স। তোর ঠাকুরমার সঙ্গে বিয়ে হ'ল—বয়স তখন তার এগার বছর। তার পর পাঁচ বছর; কত কথা কইলে, কত সোহাগ করলে। কত মান অভিমান, কত হাসি-কান্না, কত সাধাসাধি। ওরে সে কত কি! তার পর তোর বাপকে ছয় মাসেরটী রেখে ব্যস্—বলে গেলেন রইলে তুমি ! ওঃ—

"আরে রইলুম ত; ছানাটাকে মানুষ করে কে ? তার পর তাও হ'ল, কিছুই আটকে বোধ হয় রইল না। হ'ল—তাও হ'ল, সেও মানুষ হ'ল। দুটো নয় পাঁচটা নয় ঐ একটা ছেলে— উনিশ বছর বয়সে এম, এটী পাশ ক'রে ডেপুটী হ'য়ে বস্‌তেই তোর মাকে বরণ ক'রে ঘরে আন্‌লুম। সইল না ভাই— আবার সংসার পেতেছিলুম বটে, তোর বাপ আর তোর মাকে নিয়ে কিন্তু বংশে ত থাক্‌বে না কেউ বেশী দিন। ব্যস্ সোণার

বৌমা আমার—আমার লক্ষ্মী মা, তোর মা রে, তোর দেবী মা—ব্যস্ আবার তোমায় বছর খানেকেরটী রেখে আমারই কোলে তোমায় ফেলে, আমারই বুকে লুটিয়ে পড়লেন। কি কাল-রোগ ঐ তোদের জানিনে ভাই—ওঃ—তোর বাপ তখন ত্রিহুতে, ছুটে এল, দেখা হয় নি। তার পর 'বছর না ফিরতেই তোর বাপ,—ঐ বেহারেই ছিল তখন। কি ছাই প্লেগ, তোকে বুকে ক'রে ছুটলুম। একদিকে যম আর এক দিকে তোকে বুকে নিয়ে এই বুড়ো হাড় ক'খানা নিয়ে যুঝেছি। আমার খুদ-কুঁড়ো, ধন দৌলত যা ছিল হারু সব নিয়ে দেবতার কাছে, তোর বাপকে ফিরে চেয়েছি—দেয় নি। জোচ্চোর, ক্রূর,—না না দিয়েছে তোকে দিয়েছে হারু, তোকেই নিয়ে আছি। তার পর থেকে সংসারে তুই আর আমি, আমাদের সোনা-গাঁয়ের সোণার জমিদার বাঁড়ুজ্যে বংশের নাম বজায় রেখেছি। কিন্তু আর ক'দিন ভাই? তোর একটী সংসার পেতে দিয়ে যাই—কবে চোখ বুজব—ডাক ত পড়ল ব'লে।"

বাইরে সে বাদলের মাতামাতি, অবিশ্রান্ত ঝর ঝর শব্দ আর টিনের ছাদে টুম্ টাম্ টুমটুমাটম্ চল্‌ছেই। আর ভিতরে বৃদ্ধের নয়নকোণে টলটল ক'রে ঝরে পড়ছে জমাট কাল শোক-স্মৃতির তপ্ত আঁখি জল।

উঠে পড়ল হরেন—ধীরে ধীরে তার দাদুর গলা জড়িয়ে ধ'রে কাপড়ে চোখ দুটী মুছিয়ে দিয়ে তাঁরই বুকে মাথা গুঁজে বল্‌লে 'দাদা—কেঁদ না'। আদরে তার ঠাকুরদাদার

কেশহীন মস্তকটীতে সাদা চুল কয়গাছি গুছিয়ে দিয়ে বসে রইল—মেঘ আর কাটে না।

* * * • *

সারা রাত্রি বৃষ্টি আর হাওয়া তাণ্ডব নৃত্য ক'রে ফিরে গেল ভোরের হাওয়ার সাথে। উদাস দৃষ্টি নিয়ে যেন সমস্ত সবুজ পাহাড়গুলো চেয়ে আছে পথিকের পানে। ছোট বড় সব ঝরণাগুলোও ভরে উঠেছে রূপালী জলে। ভিজে মাটী আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় পথে-চলার দল বেশ ক'রে গরম কাপড়ে অঙ্গ ঢেকে চলে ফিরে বেড়াতে লাগল। ভোরের আলোয় দিগন্ত বিস্তৃত জলের ছাওয়া দূরে অদূরে সবুজ পাহাড়ের গায়ে মাখান দেখে যতদূর সম্ভব গরম হ'য়ে, তারাও নাতি ঠাকুরদায় 'চা' খেয়েই বেরিয়ে পড়ল বরাবর ষ্টেশনের দিকে। সে দিন বুধবার—পরের দিনের 'মেলে' দুজনের স্থান রাখার ব্যবস্থা ক'রে তার পর যতদূর পারা যায় ভ্রমণ সেরে বাড়ী ফিরলেন উভয়েই।

বৃহস্পতিবার সকালেই ছিল যাওয়ার কথা। গুছান ছিল সবই, বৃদ্ধ বল্‌লেন—লক্ষ্মীবারটা দাদা, আর কিছু নয়, কি করবি ?"

হারু বল্লে—"চল দাদা, ভাল লাগ্‌ছে না আর। বৃহস্পতি-বারের সকালে যেতে দোষ নেই কেমন ? চল, মেলে ত একটা কাম্‌রা দেবে। তুমি কি বল ?"

"চল ভাই—তুমিই আমার শেষ সম্বল তোমার জন্যেই

এখনো থাকা। 'টিকিটা' তোর বেঁধে দিলে আর ত থাকবি না আমার কাছে; তখন আমাকেই পথ দেখাতে হ'বে। তোর 'হিল্লে' হওয়া পর্য্যন্ত এই কয়টা দিন ব্যস্!"

"তোমার ওই এক কথা দাদা, অমন করলে—আমি—"

"বৌ খুঁজে নিয়ে তার পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিবি।"

"না না, দেখে নিও, ওই বৌ ফৌ চল্‌বে না—ওসব দরকার নেই—হাঁ—।" ব'লে হারু হেসে ফেল্লে।

বুড়ো বল্‌লে—"কথাটিই এমনি মিষ্টি যে তুই হেসেই লুটোচ্ছিস্—হ'লে ত তুই—ওরে আমরা তবু তাদের—হা—হা, এ্যাঁ, ওরে সে তোর ঠাকুমা জানত।"

২

'যাইরে বাপ্‌রে' 'যাইরে বাপ্‌রে' ক'রে ত পাহাড় ভাঙ্গ্‌তে ভাঙ্গ্‌তে ডাক-গাড়ী দারজিলিং থেকে ছেড়ে 'ঘুম' এর আগে 'বাতাসিয়া-লুপের' কাছে আট্‌কে গেল—রেল লাইন বিচ্যুত হ'য়ে। ওভারসীয়ার এল, যন্ত্রপাতি এল। গাড়ীর চাকা লাইনে উঠল। দেরী ত যথেষ্টই হ'য়ে গেল। মাঝ-পথে এসে আবার নাম্‌ল বৃষ্টি। উঃ কি নিদারুণ মূর্ত্তি প্রকৃতির! কোথায় তার সে শ্যামাঙ্গী বেশ। শ্বেত, কম্পমান শ্বেত মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে যেন প্রলয়ের সৃষ্টি করতে চায়। 'মহানদী' ছাড়িয়ে গাড়ী বাঁশী বাজাতে লাগল আবার। আবার "ডেঞ্জার-সিগন্যাল"। সংবাদ—পাহাড় ভেঙ্গে পথে স্তূপাকার হ'য়ে রেল লাইন আটক করেছে। রাশি রাশি পাথর আর মাটি আর বড় বড় গাছ। আবার কুলী এল, লোক এল। 'তিনধেরিয়া' ঠিক সেই পাহাড়টার নীচে।

আবার যখন পথ পরিষ্কার হ'য়ে গেল, গাড়ী দৌড় দিলে, ঘণ্টার ওপর আরও আধ ঘণ্টা দেরী ক'রে। তিনধেরিয়া ষ্টেশন পৌছানর আগে আর একবার থামল গাড়ী—আবার বাঁশী বাজাতে বাজাতে।

সেপাই-ঝোরা

উপরকার ভাঙ্গা পাহাড় গড়িয়ে প'ড়ে পাহাড়ের তলে রেল লাইনও বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আবার কুলি এল, কোদাল এল— পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল। গাড়ীও দৌড় দিলে আবার— পৌনে দু'ঘণ্টা লেট্।

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। 'শুকনা' জঙ্গল পার হ'য়ে 'শুকনা' ষ্টেশনের শুষ্ক ভূমে গাড়ী এসে দাঁড়াতে হরেন নেমে জেনে এল, শিলিগুড়িতে মেল ট্রেন পাবে কি না। অনেক তোষামোদের পর 'তার-বাবু' জেনে দিলেন—'আছে।'

*　　*　　*　　*　　*

তাই হ'ল; শিলিগুড়িতে বড় লাইনের গাড়ী পাওয়া গেল।

পেট ভরে আগুন পুরে আর বুক ভরা বোঝা নিয়ে গাড়ী শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে গেল, হারু বল্‌লে তখন—

"দাদু সকালে বেরিয়েছিলুম তাই এ ট্রেনটা পেলুম। বিভ্রাটের ত অন্ত নেই পথে, কিন্তু কি হ'ত এর পরে যদি এসে 'মেল'টা না পেতুম?"

"দেখ আবার কোথায় গিয়ে কি হয়—রাতটা ত কাটলে বাঁচি।"

অধিক রাত্রে গাড়ী বদল ক'রে পার্ব্বতীপুরে বড় গাড়ীতে নিজেদের নির্ব্বাচিত কামরা দখল ক'রে বসে বাকী রাত্রিটুকু কাটাবার আশে হারু তার ঠাকুরদার জন্যে একটী বিছানা ক'রে দিল। কম্বল ঢাকা দিয়ে তার দাদুকে শুইয়ে নিজেও পাশের লম্বা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল কম্বল চাদর বিছিয়ে।

বড় লাইনে মেল ট্রেন হুস্ হুস্ ক'রে চলতে লাগল, যতটা পারলে শীঘ্র যাবার চেষ্টায় অবিশ্রান্ত সোঁ—সটাংসট্—সোঁ—সটাংসট্ ক'রে চল্লো ছুটে। রাত্রিটা মন্দ কাট্‌ল না।

ভোরের আলোর সাথে ঘুম ভেঙ্গে গেল হারুর। সার্সি তুলে চেয়ে চেয়ে যেতে লাগল দুধারের সবুজ মাঠ আর ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে। পোড়াদহর আগের ষ্টেশনে এসে গাড়ী আধ ঘণ্টা প্রায় রইল দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কি বোঝা গেল না—শোনা গেল—পাখা পড়েনি।

মুখ হাত ধুয়ে হারু চায়ের ব্যবস্থা ক'রে তার ঠাকুরদার জন্যে, বাহিরের পানে চেয়ে রইল—চা এল। গাড়ী ছেড়ে তারপর পোড়াদহে গিয়ে বিশ্রামার্থে সোঁ ক'রে নিশ্বাস ফেলে থেমে পড়ল।

হৈ হৈ ব্যাপার, প্লাটফরম ভরা লোক; ব্যাপার কি? হারু নেমে গেল; শুন্‌লে—ঢাকা মেলের সঙ্গে একটা 'শান্টীং' ট্রেনের ধাক্কা লেগেছে। চক্ষুস্থির!

হারু এসে বল্লে—"দাদু শুন্‌লে ব্যাপার? রাত্রি দুটার পর গাড়ীর ঠোকাঠুকি হয়েছে; সময়ে এসে পৌছলে আমাদের গাড়ীও ঐ সময় এসেই পোড়াদ' পৌছাত—কিন্তু ভাগ্যক্রমে এও লেট্—ঢাকা মেল ত ধাক্কা খেলে, কিন্তু কি ভীষণ কাণ্ড দাদু?"

"আরও কত দেখবি ভাই। এই ত তোদের জীবনের আরম্ভ। কিন্তু আমি ত জড় পদার্থের মত বসে রইলুম। চল্

একবার নামি, দেখি চেয়ে দেবতার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কেমন!"

বৃদ্ধ নেমে বল্‌লেন—"কোথায়, ওঃ ঐ যে ভাঙ্গা ট্রেনটা দাঁড়িয়ে! তা,—ঠিক্ কোথায় ঘটল ব্যাপারটা?"

"হাল্‌সা ষ্টেশনের ঠিক আগেই।"

"তারপর?"

"তারপর, তুমি বস দাদু গাড়ীর ভেতর, একটু দেখে শুনে আসি? কেমন যাই?"

"আলবৎ যাবি।"

"তুমি গিয়ে বস দাদা—"

" না ভাই, থাবনা ধাক্কা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তোর ভয় নেই। কিন্তু আস্‌বি শীগ্‌গীর—জান্‌লিরে—"

৩

রাত্রি ঘনান্ধকার; টিপ্ টিপ্ থেকে সুরু ক'রে টপ্‌টপাটপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল তখন। জন-মানব পথে ত দেখা যায় না, জেগে কেউ আছে ব'লে মনে হয় না। শুধু সুদূর পথের যাত্রী যারা, দিক্‌দিগন্তে যাদের কাজ, দেশ বিদেশে যাদের যাওয়া আসা, ছিল জেগে বুঝি তাদের কেউ কেউ। সমুদ্র বক্ষে কেউ জাহাজে, নদী বক্ষে কেউ নৌকায়, আর স্থলে—হুস্ হুস্ ক'রে যে রথ সহস্র যাত্রীর মরণ বাঁচনের সোণার কাঠি রূপার কাঠি হাতে নিয়ে ছুটছে—কেউ বা সেই রথে!

*　　*　　*　　*

বিধবার কেউ নেই; ঐ একটা মেয়ে যুথিকা—আর একটী মাস কতকের শিশু। পোড়াকপালির কপালে একটা বরও ত জোটে না! ছেলে ও মেয়েটিকে নিয়ে বিধবা গোয়ালন্দ থেকে আস্‌ছিলেন; দারিদ্র্যের শীতল স্পর্শে, কঠোর তাড়নায় তিনি প্রকৃতিস্থা কি না জানা ছিল না। শত যাত্রীর মাঝে সেই মা আর মেয়ে। মেয়ের কোলে সেই ছোট্ট ভাইটি তার। পরেশ মুখোপাধ্যায় গোয়ালন্দে রেল অফিসে চাকুরী করতেন সেইখানেই

স্ত্রী কন্যা নিয়ে বাসা বেঁধেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত হ'য়ে কতকটা চিকিৎসা অভাবে কতকটা নিয়তির পরিহাসে পদ্মার ধারে তাঁর ক্রন্দনরতা কন্যা-পত্নী আর সেই শিশুটীকে রেখে নিজের নশ্বর দেহের ব্যবস্থা ধূলায় মিশিয়ে পদ্মার ঢেউএ স্মৃতির কণাটুকু ভাসাতে ভাসাতে পরপারে সরে গেলেন। বিধবা ভিক্ষা ক'রে স্বামীর সৎকার শেষে অকূলে কূল খুঁজতে গোয়ালন্দ থেকে কল্‌কাতা অভিমুখে রওনা হ'লেন—হতভাগা মেয়েটার হাত ধ'রে। মায়ে-ঝিয়ে কত কেঁদেছে, কান্নার তাদের বিরাম নেই—কেঁদে কেঁদে যখন শিথিল দেহ অবসন্ন হ'য়ে এল তখনও বাইরে ঝির্ ঝির্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, তার ওপর সেই গভীর অন্ধকার। গাড়ী পোড়াদ' ছাড়িয়ে ছুট্ দিলে তারই মাঝে—সেই আঁধারের মাঝে হতভাগিনিদের বুকে নিয়ে।

তার পর? তারপরই সে কি ভীষণ শব্দ! দুনিয়া জোড়া বম্ যদি ফেটে চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়া ক'রে দিয়ে যায় তাহ'লেও কি এমনি শব্দ হয়? জীবন্তে কবর দিতে প্রকৃতির সে কি পিশাচ হাসি! লীলাময়ের লীলা কীর্ত্তন করতে রইল কেউ কেউ কিন্তু সে অন্ধকারে কারুর বোধ শক্তি চেতন অবস্থায় কাকেও বুঝি বুঝতে দিলে না যে কি হ'ল। বৃহস্পতির রাত্রি—ঢাকা মেল নিয়তির আজ্ঞাবহ হ'য়ে তাদের ব্যবস্থা ক'রে দিলে যাদের মেয়াদ ফুরিয়েছিল। কোথায় বাপ, কোথায় মা—শিশু ধূলায় লুটায়! কোথাও বা স্বামিহারা পত্নীর আকুল ক্রন্দন! আর অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোথাও বা কেউ জীবন্তে সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে!

কারুর হাত আছে পা নেই, কারুর মেয়ে আছে মা নেই! দম ফেটে চীৎকার করবার ক্ষমতা কারুর আছে কারুর বা গুমরে কাঁদারও শক্তি নেই! রেলের গাড়ীর চাকায় কেউ বা পিষে গেছে, কেউ বা তার চাপা-প'ড়ে যাওয়া পা দুখানা টেনে বার করতে না পেরে অবসন্ন দেহে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছে! প্রলয় আর কাকে বলে!

যুথী তার মাকে খুঁজে পায়নি; ভোরের আলোর সাথে সে তার ছোট্ট ভাইটিকে বুকে চেপে ধ'রে নিজের রক্ত মাখা কপালটা আঁচলে ঢেকে ছিন্ন লতাটীর মত টলে টলে আকুল আবেগ চাহনিতে প্রলয়ের শেষ দৃশ্যটুকু দেখে নিলে। নিয়তির পরিহাস-মাখা সে যন্ত্রণাময় ছবি বুকে এঁকে নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রাণে তার লুব্ধ দৃষ্টি নিয়োগ ক'রে খুঁজতে চাইলে তার সদ্য বিধবা হতভাগিনী মাকে!

কই মা ত নেই! কান্না তখন তার শেষ হ'য়ে গেছে। যন্ত্রচালিতের মত শত আহত লোকের পাছে পাছে খোড়াদহ ষ্টেশনের দিকে যুথী চলে গেল। কাঠের পুলটার তলে বসে তার নিরাশ দৃষ্টি চিন্তার অকুল কিনারে এনে ফেলে দিয়ে গেল—ভাব্‌তে সে আর পারে না!

কোলে তার শিশু ভাইটী জানত না তার কি হয়েছে আজও জানলে না তার কি হ'ল। ডব্‌ডবে চোখ দুটো নীল আকাশের পানে মেলে ধ'রে চেয়ে চেয়ে হাত পা ছুঁড়ে সে তার দিদির কোলেই হাস্‌তে লাগল। ছোট্ট ছেঁড়া জামাটী তার রক্তের ফোঁটায় রঙ্গীন্!

সেপাই-ঝোরা

*　　*　　*　　*

হরেন পড়ত ক্যাম্বেল স্কুলে। দাদু তার আদরের নাতিকে বলেছিলেন "তোর আর ডাক্তারী পড়ে কাজ নেই।" কিন্তু সে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে যখন অনুমতি পেলে তখন ডাক্তারী তার কোন কলেজে গিয়ে পড়ার বাসনা ত্যাগ ক'রে ক্যাম্বেল স্কুলে গিয়ে অনেক কষ্টে তাকে ভর্ত্তি হ'তে হয়েছিল। তার পড়াও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। খুব চালাক, চতুর, চট্‌পটে ছেলে সে। থাক্‌ত সে তার দাদার সঙ্গে ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ীতেই। হিন্দু ব্রাহ্মণ একটী ঠাকুর, আর দুই একটী ভৃত্য আর সে আর তার ঠাকুরদাদা ছাড়া সংসারে আর কেউ ছিল না। যাহোক ক'রে রাশি প্রমাণ শান্ত নিরালার মাঝে তাদের দিনগুলো কেটে যেত —তার ঠাকুরদাদার জমিদারীর আয়েই! মন্দ কি?

হারু যখন তার দাদুর অনুমতি নিয়ে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে চলে গেল, দাদু তার একটী কামরার পেতলের হাতল ধ'রে তাঁরই হারুর পানে তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টিটুকু চশমার কাচ দুখানির ভেতর দিয়ে নিয়োগ ক'রে চেয়ে চেয়ে রইলেন। কখনও বা ইতস্ততঃ পদচারণ ক'রে, কখনও বা আবার পূর্ব্বের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলেন তাঁর আদরের নাতিটী কি করে।

প্ল্যাটফরমের ওপরেই অনেক আহত ব্যক্তি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছিল। কোঁচা ছিঁড়ে যে ক'টা পারা গেল বেঁধে দিয়ে হরেন গার্ড সাহেবের কাছ থেকে কত দিনের সঞ্চিত জানি না, কোম্পানীর 'ফার্ষ্ট এডের' বাক্স থেকে গোটাকতক শিশি নিয়ে

আবার এল। যে ক'টাকে শুশ্রূষা করতে পারে ক'রে, দুপুর রোদে সে হালসা ষ্টেশন পর্য্যন্ত একবার ঘুরে এল।

বর্ণনাতীত সে দৃশ্য দেখে হরেন বিমূঢ় মোটেই হয়নি; ক্ষমতা তার যতটুকু ততটুকু সাহায্য সে শুধুহাতে ক'রে যখন ফিরলে তখন তার দাদুর জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে। বুড়ো কত ভাব্‌ছে তার জন্যে—যাই!

নাতিটী দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ কামরার মধ্যে প্রবেশ ক'রে চুপটী ক'রে বসে রইলেন। কতবার উঠেছেন, উঁকি দিয়ে দেখেছেন; হারু ফেরেনি। বেলা দুপুর পার হওয়ার পর আবার তিনি নেমে দাঁড়ালেন; অনেকক্ষণ নেমে দাঁড়াবার পর দেখ্‌লেন হারু আস্‌ছে, শুক্‌নো, ক্ষুধার্ত্ত মূর্ত্তি! ঐ যে!

হারু ফিরে আস্‌ছিল হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল, কাঠের পুলটার নীচে। একটী মেয়ে আলুথালু কেশ, শুষ্ক চেহারা, দারিদ্র্যের ভীষণ স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান তার। ফুরিয়ে-যাওয়া কান্নার ভীষণ গম্ভীরমূর্ত্তি—লাল বড় বড় সজল চোখদুটী নিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে এক শিশুর পানে—কাঁদ্‌ছে শিশু ক্ষুধার ব্যথায়। তাকে শান্ত করার শক্তি বালিকার নেই, শুধু বুকে চেপে রেখেছে।

বালিকা, বালিকাই ত! সীমন্তে কৈ সিন্দুর রেখা ত নেই; অবিবাহিতা বালিকা—শিশুটীই বা কার; কে? যেই হোক্—কি জানি। কত কি ভেবে ধীরে ধীরে সে পুলটীর তলে এসে দাঁড়াল। ছিন্ন বস্ত্র তারও একটী মোটা তসরের পাঞ্জাবীর তলে কোন রকমে জড়ান আছে—যতটা পারা যায় ছিঁড়ে সে

আহতের 'ব্যাণ্ডেজ' করেছে। সেই ভাবেই বালিকার পাছে এসে সে দাঁড়াল—স্থির দৃষ্টি বালিকার তাকে বুঝি দেখেনি —চেনেনি, সেও একটা মানুষ!

হারু ধীরে ধীরে বালিকার কোল থেকে শিশুকে তুলে নিয়ে বল্লে—"ভয় নেই ভাই—"

গোল শান্ত একখানা মুখ বড় শান্তভাবেই তুলে উঠল—বড় বড় চোখদুটো তার টলটল ক'রে উঠ্‌ল, সেই সঙ্গে উষ্ণ জমাট চোখের জল হারুর হাতের ওপর গড়িয়ে পড়ল। বালিকা তার দৃষ্টি স্থির ক'রে চেয়ে রইল হারুর পানে, কতক্ষণ সে জানা নেই—অনেকক্ষণ। পরমুহূর্ত্তেই সে তার দৃষ্টি শিশুর পানে ফিরিয়ে নিয়ে ভাঙ্গা গলায় বল্লে বড় কঠোর কিন্তু করুণ স্বরে—"ওগো দাও—ও আমার, আমার ভাই।"

হারু কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লে—"কিচ্ছু ভয় নেই তোমার, আমার সঙ্গে এসো।" বাঁ হাতে শিশুকে বুকে চেপে ডান হাতে বালিকার হাতটী ধ'রে তুলে বল্লে আবার—"এস, চল আমার সঙ্গে—ঠাকুরদার কাছে।"

বালিকা নির্ব্বাক। এমন স্বর ত সে জীবনে কোন মানুষের গলায় শোনেনি। সংসারে চিন্‌ত সে তার মাকে আর বাবাকে। তাই বা ক'দিন—কিন্তু এ কে? তারই মত কোন দুর্ভাগা সর্ব্বস্ব হারিয়ে ছিন্নবস্ত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আবার তাকেই সাদরে আহ্বান করছে—বল্‌ছে চলো? যাব—কে সে? ওঃ আর ভাব্‌তে পারে না—কাঠের পুতুলের মত সে হারুর সাথে

চল্‌তে লাগল—পা যেন চল্‌তে চায় না, অবশ শিথিল চরণে সে যখন হারুর পানে চেয়ে চেয়ে চল্‌ছিল, শিশুর ক্রন্দন তখন থেমেছে—বালিকা সজল নয়নে শিশুর পানে চেয়ে দেখ্‌লে—সে তার ছোট্ট হাতটী দিয়ে চোখ ঢেকেছে হারুর বুকে।

অবসর কারুর ছিল না; এ দৃশ্য, এ ছবি—কারুর অবসর ছিল না দেখার। আর কে দেখেছিল জানি না, আকাশ থেকে কেউ দেখেছিল কি মনে নেই; কিন্তু ঠাকুরদাদা তাঁর হারুর প্রত্যেক কাজটী দেখেছিলেন, যতক্ষণ তিনি তাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। হারুকে সে ভাবে আস্‌তে দেখে তিনি ধীরে ধীরে কামরার মধ্যে প্রবেশ ক'রে চুপটি ক'রে বসে রুমালে একবার সমস্ত মুখটী মুছে নিলেন। কি শান্ত, কি স্নিগ্ধ মূর্ত্তি!

এক হস্তে হারু শিশুটীকে বক্ষে চেপে ধ'রে অপর হস্তে সেই বিরাট শোকে পাগল—সে পাগলিনীর শিথিল হস্ত ধ'রে ধীরে ধীরে কামরার মধ্যে প্রবেশ করল; যেন কোনটাই নূতন নয়—কারুর কাছে। "এই আমার দাদু" ব'লে হারু বালিকাকে তার দাদুর পাশে টেনে নিয়ে গেল।

"আয় দিদি আয়" ব'লে বৃদ্ধ কেঁদে ফেল্লেন—অস্ফুট স্বরে বল্লেন—"হা পোড়াকপালি, কি হারিয়েছিস্, কি তা যে জানিনে বোন্, বস্ এখানে" ব'লে বালিকাকে কোলে টেনে নিলেন।

বালিকার কোলে অনেক অনিচ্ছায় হারু বুক থেকে শিশুকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঠাকুরদাদা ডাকলেন—"হরেন্দ্র"—"আস্‌ছি দাদু, এখনি, একটু দুধ—" ব'লে হরেন দৌড়ে চলে গেল।

৪

... কোথা থেকে কি হয়েছিল জানাবার আবশ্যক বোধ করেনি হারু; কিন্তু শিশুর দুধ পর্য্যন্ত এনে দিলে হরেন কোথা থেকে অনেক চেষ্টায়; আর দাদুকে তার চা খাইয়েছিল জানি 'এঞ্জিনের' 'বয়লার' থেকে প্যানে ক'রে জল এনে। বড় চমৎকার ছেলে।

ভাঙ্গা রেল লাইন ঘুরিয়ে দিয়ে নূতন লাইন পাতা হ'ল; অবেলায় গাড়ী ঢিকিঢিকি ক'রে পোড়াদ' ছেড়ে হালসা পর্য্যন্ত এসে পঁহুছল। কত আহত ব্যক্তিকে ঐ মেলেই তুলে কলিকাতা পাঠান হ'ল হাঁসপাতালে। সে সব অনেক কথা, ব'লে শেষ করা যায় না। তবে 'রিলিফ-ভ্যান্' পোড়াদ' পঁহুছেছিল সকালে এ আমরা (?) দেখেছি; আর গাড়ীতে গাড়ীতে ঠোকাঠুকি হয় রাত্রি আন্দাজ দুটোয়।

হালসা পেরিয়ে গাড়ী আবার পূর্ণ উদ্যমে কলিকাতাভিমুখে ছুট্ দিলে। হুস্ হুস্—হু-হু—উঃ কি ভয়ানক আজকের দিনটা!

ভাবনার কুল কিনারা বাস্তবিকই কারুর ছিল না। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ঠাকুরদা হরেনকে বল্লেন—"হারু দিদির আমার নামটী কি?" হারু বল্লে—"জানি না ত দাদু, সে কথা।"

আদর ক'রে দাদু বালিকার মুখের পানে চেয়ে তাকে বড় স্নেহে টেনে নিয়ে বল্লেন—

"তোর নামটী বল্ ভাই, কি ব'লে ডাক্‌ব তোকে ?" কোন সাড়া নেই। আরও আদর, আরও স্নেহ—বালিকার চক্ষু ধৈর্য্য মানে না আর। কেঁদে ফেলে সে বল্লে—"যু-যুথিকা।"

তারপর আর কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন ভেবে বৃদ্ধ চুপ ক'রে বসে রইলেন। অন্য পাঁচ কথা কওয়ার পর নৈহাটী ছাড়িয়ে গাড়ী কলিকাতার পানে দৌড় দিয়েছে।

শুধু এইটুকু বলেছিল যুথি'—যে তার বাবা অল্পদিন হ'ল মারা গেছেন ; তাঁর শ্রাদ্ধ শেষে মা সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থে শিশু পুত্র ও বালিকা কন্যা নিয়ে কোথায় কোন্ গ্রামে তার মামার বাড়ী যাচ্ছিলেন সে দিন। সে আর কোন কথা জানে না। তারপর —তারপর সেই ভীষণ শব্দ—সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ড ; ভয়ানক গর্জ্জন—ব্যথিতের করুণ ক্রন্দন সেই ঘোর আঁধারের পিশাচ হাসির সাথে মিশিয়ে তার কানে মিলিয়ে গেছে। অভাগী সে বেঁচে ছিল —ভাইটীকে বুকে নিয়ে। মাকে তার খুঁজে পাওয়া কই যায়নি ; —তাঁরা ব্রাহ্মণ !

হরেনও অনেক চেষ্টা করেছে—নিষ্ফল সেও। গাড়ী সন্ধ্যার আগে কলিকাতায় এসে হাঁফ ছাড়ল যখন খোকা তখন দাদুর কোলে ঘুমুচ্ছে।

সেপাই-ঝোরা

পরের দিন ভোরের বেলায় হারু স্কুল চলে গেল। পূর্ব্বরাত্রে নূতন আহত ব্যক্তি যত এসেছিল হাঁসপাতালে, প্রত্যেকটীকে দেখে দেখে বেড়াল, সকলেই প্রায় পুরুষ মানুষ—আহত ভদ্র ব্যক্তি, চেকার প্রভৃতি। 'অবসার্ভেশনে' যত রোগী ছিল তাহাদেরই কাছে খুঁজে খুঁজে সে যাঁকে চায় পেলে তাঁকে—সেই যূথির মা। বিধবার ফর্সা চেহারাখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে—মাথার পাশ দিয়ে অনেকটা ব্যাণ্ডেজ করা; প্রাণবায়ু আছে এখনও। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তাঁরই পানে হারু চলে গেল। হ'তেও ত পারে ইনিই—মুখখানি ত—হ'বে।

'ফোনে' যখন শুন্‌লেন ঠাকুরদাদা যে হারু তাঁকেই ডাক্‌ছে, তিনি বল্লেন—"কি চাই হারু ?"

"শীগ্‌গীর যুথিকাকে আর তার ভাইকে নিয়ে একবার আস্‌তে হ'বে, আমি স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে আছি।"

"এখুনি যাচ্ছি" ব'লে ঠাকুরদা' তৈয়ারী হ'লেন। বাড়ীর গাড়ী—'সোফার' উড়িয়ে এনে পৌঁছে দিলে তাঁদের। রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে যুথি বল্লে—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কিন্তু স্থির দৃষ্টি রেখে তাঁর পানে—"হ্যাঁ এই আমার মা।"

কথা কওয়ার শক্তি ছিল না রোগিনীর। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তাঁদের পানে অবশ হাত দুখানি তাঁর নড়ে উঠ্‌ল। বৃদ্ধ তাঁর বুক থেকে শিশুকে নামিয়ে নিয়ে তার মায়ের বুকে শুইয়ে দিলেন। হতভাগিনী বড় কষ্টে হাত দু'খানি তুলে চেপে ধরলে শিশুকে; তারপর চোখ দুটী তাঁর আপনিই বন্ধ হ'য়ে গেল—ঠোঁট কেঁপে

উঠ্‌ল। দৃষ্টি স্থির ছিল যতক্ষণ, বৃদ্ধের পানে চেয়ে—ক্ষণিক আনন্দ ক্ষণিক তৃপ্তির রেখা অভাগিনীর চোখের কোণে ফুটে উঠ্‌লেও বৃদ্ধের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ফুটে ওঠেনি।

যুথিকা লুটিয়ে পড়ল; বৃদ্ধ ভগ্নস্বরে ব'লে উঠ্‌লেন—"এমনি শিশু তুইও ছিলি হাস্নি, তোর মা যখন তোকে রেখে আমার কাছে, এমনি ক'রেই চোখ বুজেছিল।"

৮

এই পূজায় একটী বছর পার হ'য়ে এখন প্রায় দেড় বছর হ'তে যায়। হরেন এখন পাশ ক'রে বাড়ীতেই আছে। মাঝে তাঁরা যুথিকার আত্মীয় স্বজন কেউ আছে কিনা খুঁজতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন—কিছু হয়নি।

বৃদ্ধের পুঁজি এখন তিনটী; বড় সুখ তাঁব, সংসারে লক্ষ্মী এসেছে—মন্দ কাট্‌তনা দিন। যুথিকা এখন তার লুপ্ত সৌন্দর্য্য ফিরে পেয়েছে স্নেহ-যত্ন ও আরও কিসের গুণে। সে তার দাদাকে বড় ভালবাসে, তাকে চোখের আড়ালে রাখ্‌তে তার প্রাণ চায় না। দাদু ত বাড়ীতেই থাকেন, খোকাও থাকে; দাদা কেন বাহিরেই—দূর্‌ ছাই তা ভেবে কাজ নেই। পাঁচ কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে হরেনের ঘরে গিয়ে তার সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে আস্‌ত।

খোকাকে নিয়ে ঠাকুরদার কাছে হল ঘরটায় শুতো যুথিকা; তার খাট থেকে বিশ হাত তফাতে সেই বড় খাটটী থেকে যখন ঠাকুরদার নাসিকা গর্জ্জন শোনা যেত তার বড় ভয় করত তখন। একদিন সে বল্লে তার আঁচলখানায় ঠাকুরদার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে চা খাওয়ার পর—

"রাত্রে কি চোর তাড়াও দাদু—অত শব্দ কেন হয় তুমি যখন ঘুমোও?"

"সাধে কি নাতনী, আর কোন রত্ন চুরির ভয় করি কি? না করেছি কখনও? তবে পাছে তোকে কেউ ফিরে নিতে আসে কি চুরি ক'রে নিয়ে যায়, এই ভয়টাতেই সজাগ থাকি। তা কি বুঝবি তুই রে—?"

"তা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘরের ভেতর নাক ডাকিয়ে লাভ?"

"ওরে হ্যাঁ হ্যাঁ—তোর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে যখন মাতাল হ'য়ে পড়ি তখন গোঁ গোঁ করি—"

"তুমি বড় দুষ্টু দাদু—"

"তোর ঠাকুমাও তাই বল্‌ত রে। সে গল্প একদিন করবখ'ন। এখন ভয় ওই হারুচন্দরকে—সে যা ছিঁচকে হয়েছে। উনি চান তুমি সর্ব্বক্ষণ তাঁর কাছেই থাক, আমার কাছে তোমার—"

"যাই আবার খোকা বোধ হয় ঘুম ভেঙ্গে কাঁদ্‌ছে।" ব'লে যুথী চলে গেল।

বিকৃত স্বর ক'রে বল্লেন দাদু—"হ্যাঁ যাও—আর অমনি উঁকি দিয়ে এস তার ঘরে—তিনি এলেন কিনা?"

মনে মনে বল্লেন—দুটোতেই হয়েছে সমান; দুটোই ছিঁচ্‌কে চোর—ব'লে সানন্দে বৃদ্ধ মুচকে হেসে একাই সেথা রইলেন। যুথিকা ঝাঁ ক'রে এসে গড়গড়ার নলটা দাদুর হাতে তুলে দিয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

হরেন বাবুর দর্শন নেই। আজও বৃহস্পতিবার। বৃদ্ধ ভেবে সারা। বাবু সেই দুপুরে বেরিয়েছেন এখনও ফেরেননি। তাই ত—কি আবার ঘটে, আর পারিনে বাপু। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, হাওয়া বইছিল খুব জোরে, বৃদ্ধ নাতনীকে আর খোকাকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন। হাওয়া বওয়ার সাথে তাঁর প্রাণটা আকুল ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু কেউ নেই—ঐ জুতার শব্দ না? সে ত ছোট গাড়ীটা নিয়ে গেছে!

বিজয় এসে ডাক দিলে। সে হরেনের বন্ধু ঐ পাড়াতেই থাকে; হল ঘরটায় এসে বিজয় ঠাকুরদাকে প্রণাম ক'রে বল্লে—"চলুন ঠাকুরদা—"

"কোথারে?"

"বাঃ—পেট্রন বলে কোথারে! আপনিই ত ক্লাবের পেট্রন। যাবেন না আজ—থিয়েটারে? প্লে হ'বে, 'পরপারে' চলুন।"

"ওঃ ভুলে গেছি—দেখ বয়স ত বড় কম—"

"না বেশী হয়নি, লোকে বলে বুড়ো—"

"তা বল্‌বি বৈকি, দেখ্‌ছিস্ এবার যূথিকে বিয়ে করব, আর এইটে হ'বে শালা আমার।" ব'লে দাদু খোকাকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালেন। যূথিকা চুপি চুপি চলে গেল। মুচকে হেসে ঠাকুরদা বল্লেন—

"দেখ বিজয়— হরেন কিন্তু এখনও আসেনি—কি ক'রে যাই?"

"তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে—সে কোথায় গেল; তবে থিয়েটারে যাবে বলেছে।"

বিজয় দাদুর মত ক'রে একরকম জেদ্ ক'রেই, যাওয়ার উদ্যোগ করতে লাগল। কিন্তু নিমন্ত্রণের কার্ড আসার পর যুথীর যে আগ্রহ ছিল থিয়েটারে যাওয়ার সময় তা আর এখন দেখা গেল না।

বড় গাড়ীটাও দরজায় দাঁড়াল, বৃদ্ধ নাম্‌বার পথে টেলিফোনে খবর পেলেন—হরেন বল্‌ছে—

"যেতে একটু দেরী হ'বে, মেডিকেল কন্‌ফারেন্সে আছি। সংবাদ শুনে যুথিকা একটু হাস্‌লে বটে আনন্দে কিন্তু বল্লে "দাদু আমি না হয় পরে যাব—দাদার সঙ্গে?"

"চল্ নাতনী চল্ অতটা ভাব্‌লে তুই তার জন্যে আমার বড় হিংসা হয়। আমার সঙ্গে গেলে কেউ বল্‌বে না তোর এই বুড়ো বরকে—সত্যকার বুড়ো; তাহ'লে কি আর আজ এই অভিনয় দেখ্‌তে যেতুম, বয়স আছে বলেই ত যাচ্ছি।" আপনার কথায় আপনিই ঠাকুরদা হেসে ফেল্লেন—বিজয়ও যুথীর পানে চেয়ে হাস্‌লে—যুথী ঘাড় নীচু ক'রে হাস্‌লে।

গাড়ীখানা যখন ফটক পার হ'য়ে চলে গেল, খোকা বল্লে "দাদুন—তুমি বুলো।"

৬

যে যুথিকা কোন দিনই তাকে না ব'লে কিছু করত না সে আজ তাকে না ব'লে থিয়েটারে গেছে শুনে হরেন বড় রেগে গেল। নিজেও সে যাবে মনে করেছিল। তাদের ক্লাবের থিয়েটার, তার দাদুই তার পেট্রন ; কিন্তু সে যখন শুনলে যুথীরা বিজয়ের সঙ্গে গেছে, রেগে সে গাড়ীটা তুলে রেখে, বৈঠকখানায় চুপটি ক'রে বসে রইল ; চাকরকে চা দিয়ে যেতে বল্লে। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে সব রাগটাই হ'ল তার যুথীর ওপর ; সে ত না গেলেই পারত ; আর ঐ বিজয়টা!

কতক্ষণ এই ভাবে সে বসে ছিল জানা নেই—সতের খানা খবরের কাগজের মাঝখানে, এমন সময় দাদুদের গাড়ী দরজায় এসে থামল। সকলে নামতেই ঠাকুরদা যখন ড্রাইভারকে বল্লেন—“বিজয়কে পৌছে দিয়ে এস, অনেক রাত হ'য়ে গেছে”, শুনে হরেনের রাগ আরও বেড়ে গেল, আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেল সে।

ঠাকুরদা বল্লেন—“লাটের বাচ্ছা তখন নিজে রাত ক'রে এসে এখন পেঁচার মত মুখ ক'রে উঠে গেল দেখ।”

অনেক সাধলে যুথিকা "ওঠ দাদা খাবে চল।" হরেন বল্লে "মোটেই খিধে নেই—আমি ঘুমোব। বিরক্ত করার দরকার কি?"

"লক্ষ্মীটি চল, তুমি না খেলে দাদু খাবে না আর আমিও—না না, চল।" ব'লে হারুর হাত ধ'রে টেনেই একরকম নিয়ে গেল যুথিকা।

পরপারে প্লে দেখে বৃদ্ধের মনটা ভাল ছিল না তাই বুঝি আহার করতে বসে দাদু বল্লেন—"ছেলেটার জন্য ভাবিনে, তোরা দু'জনে রইলি—কিন্তু এখনও ত দুটো কাজ বাকী রইল আমার। এই মেয়েটার একটা কিনারা করা আর তোর একটা হিল্লে ক'রে দেওয়া। তা পাত্র পাত্রী দুইই একরকম ঠিক হ'য়ে গেছে।"

"এর মধ্যেই ঠিক হ'য়ে গেল দাদু?"

"তা ভাই অনেক কষ্টে; আর হাল্লাক হ'য়ে গেছি, আমার আর কাকে নিয়ে কুল ধর্ম্ম। যা হয় তোদের এক একটি হ'লে বাঁচি, আর আমারও ত মেয়াদ ফুরিয়ে এল ভাই।"

"যাই আবার, খোকা খাট থেকে পড়েই গেল না কি—" ব'লে যুথিকা উঠে গেল সেখান থেকে।

হরেন চুপটি ক'রে খেতে লাগ্‌ল—ঐ মেয়াদের কথাটা দাদু যখনি বলেন তার কেমন ভাল লাগে না।

* * * *

যুথিকার বিয়ে যে দাদু এত শীঘ্র ঠিক ক'রে ফেল্‌বেন তা

হরেন আশাও করেনি। সেদিন পাত্র কে জিজ্ঞাসা করা আর আবশ্যক বোধ করেনি ; একদিন কথাটা পাড়তেই বৃদ্ধ বল্লেন—

"কেন চেননা তাকে, আমি কি একটা অপগণ্ড যে যাকে তাকে ধ'রে এনে তার হাতে আমার যুথিকে দেব ?"

হরেন চুপ ক'রে রইল। তাহলে, কিন্তু বিজয় ছোঁড়াটা কি দুষ্টু, আসে আজ্‌কাল ত রোজই—আর উঠ্‌তেও চায় না। যুথিও একটু দূরে দূরে থাকে, দাদুর চোখ ত পড়েনা এমন জায়গা নেই। কিন্তু কি নিষ্ঠুর, অম্লান বদনে মেয়েটাকে বিদায় দেবে বাড়ী থেকে ; ফূর্ত্তি যেন ঠাকুরদার আরও বেড়ে চলেছে। কিছুরই অপেক্ষা রাখেননি তিনি, কিছুই জিজ্ঞাসা করবার দরকার বোধ করেননি ? আশ্চর্য্য ! বুড়ো বয়সে ভীমরতিই ধরেছে না কি ? কিন্তু ঐ বিজে ছোঁড়াটা —উঃ—আর ভেবে কাজ নেই।

বুকের ভেতর আগুন জ্বেলে দিলে কে কার জানিনা, হরেন বাবু বড় গম্ভীর হ'য়ে ঘরে বসে ভাব্‌তে ভাব্‌তে শুয়ে পড়লেন।

যুথিকা এসে ডাক্‌লে—"দাদা"—

"বল" ব'লে হরেন ফিরে শুলো অন্যপাশে—

"খাবে না ? ওঠ—দাদা, ওঠ—ভাই।"

কোন সাড়া শব্দ নেই—নিজের সজল চোখ দুটী তুলে যুথি বল্লে—"খাবে চল ভাই ; আজও তোমার রাগ পড়েনি ? আর কখনও তোমায় না ব'লে যদি বাইরে যাই তুমি আমায় যা খুসী কোরো—এ বারটি মাপ করো ভাই লক্ষ্মীটি, ও দাদা—কেন এখনও

রাগ ক'রে আছ—তুমি ক'দিনে যেন কি রকম হ'য়ে গেছ—ওঠ।" ব'লে যখন টান দিলে যূথিকা হরেনের হাতটা ধ'রে—সে বল্লে—

"তুই কি বুঝ্‌বি বাঁদরী—তুই—"

"তা বেশ চল—চল ভাই।"

"চল" ব'লে হরেন উঠ্‌ল। মনে মনে বল্লে "ঐ বাঁদরটার হাতে শেষে দাদু দিয়ে দেবে তোকে, আমি কি তোর দাদা নই? —দা—দা, সেই বেশ।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হরেন উঠে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

সে দিনকার সন্ধ্যায় বাড়ীময় হৈ হৈ; নহবৎ বসেছে। বাড়ী আলোয় আলো। হরেন উপর থেকে আর নামেনি। পাড়ার মেয়েরা বাড়ী গুল্‌জার ক'রে রেখেছে। সে কি হৈ হৈ দাদুর, যেন একাই আজ সব ক'রে ফেলবেন এই অশীতি বর্ষ বৃদ্ধ বয়সে। রাতটিও বেশ জ্যোৎস্না-মাখা। হরেন চুপটি ক'রে নিজের ঘরে বসে জানালার ধারে আকাশপানে চেয়েছিল। তাল ঠিক ছিলনা সে এমন সময় ঠাকুরদা এসে বল্লেন—

"কবিত্ব রেখে একটু কাজ আমার ক'রে দাওনা—তিন তলার ওপর বসে থাক্‌লেই কি শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়—তোর নিজের বাড়ীতে! আমি বুড়ো মানুষ, একা আর কত পারি?"

"আমি কিছু করতে পারব না দাদু।"

"আর কিছু না পার একটা কাজ কর, বড্ড ছোট্ট কাজ। তোমায় না ব'লে একটা তুচ্ছ কাজ কবে করব বলেছি তাই এত

রাগ? আমার কি কোন জোর নেই তোর ওপর? যা ভাই একবারটি শেয়ালদায়। ষ্টেশনে গিয়ে বর তুলে নিয়ে আয়, সময়ও হয়েছে ঠিক যাবার। যা সেখানে তোর চেনা লোক দেখ্‌তে পাবি, তোকে কিছু করতে হ'বে না; শুধু যাবি আর আসবি। আর তোর হাত ধ'রে অনুরোধ করছি, আর কোথাও যাস্‌নে—শুধু ঘুরে দেখে আয়।"

হরেন উঠ্‌ল; হেসে ফেল্লে মুচকে তার দারুণ জ্বালার মাঝেও। বল্লে—

"খুব মন ভোলাতে পার দাদু সবার—"

"না ত কি অমনি তোর ঠাকুমা আমার হয়েছিল?"

"তাই বল্‌ছি"—ব'লে হরেন একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শেয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে দেখে ফটকের কাছে বিজয় শুধু ফুলের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তার কাছে গিয়ে বল্লে হরেন—"কই কি কর্‌তে হ'বে বল।" বিজয় হেসে ফেল্লে, বল্লে, "বর ঠিক সময়ে যাচ্ছে—এই 'গড়ে' মালাগুলো নিয়ে গিয়ে দাও ঠাকুরদাকে; তোমার আর কিছু করবার নেই।"

"বর—?"

"সে ঠিক সময়ে গিয়ে পৌছুবে; তোমার কোন ভাবনা নেই।" ব'লে বিজয় চলে গেল।

বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হরেন বাড়ীর দিকে গাড়ী ঘোরাতে বল্লে।

*　　*　　*　　*

বড় গাড়ীখানা দরজায় এসে যখন দাঁড়াল, ঠাকুরদা' তখন একখানি ভসরের ধুতি প'রে সদরেই খোকার হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছিলেন।

রেগে চীৎকার ক'রে হরেন বল্লে গাড়ী থেকে নাম্‌তে নাম্‌তেই—"যত গাঁজাখুরী, কোথায় বর? বরটর কিছু নেই। বিজেটা এই মালাগুলো হাতে দিলে।"

দাদু বল্লেন "হাঁ হাঁ বর এসেছে; আমি যে সারাদিনটা উপোস ক'রে বসে আছি ভাই তোরই হাতে যুথিকে সম্প্রদান করব ব'লে, তুইই যে তার বর।"

বৃদ্ধ তাঁর হারুর গলায় মালা পরিয়ে এক রকম কোলে ক'রেই হরেনকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। চীৎকার ক'রে বল্লেন—"বর এসেছে।"

ভেতরে শাঁখের সোরগোলে আর হরেনের রাগ দেখে চম্‌কে গিয়ে খোকা, যুথী যেথায় 'সাজ-সজ্জা' ক'রে বসেছিল, সেখানে গিয়ে তার কাপড়টায় টান দিয়ে বল্লে—

"দিদি আজ দাদা ভালি লেগে গেছে—দাদুল্ ওপল্; তুই দাদাকে থামাবি তল্।"

লেবু-মামা

১

মেদনীপুরে আমাদের বাঙলোর কাছে লোকজনের বসতি তখন খুব বেশী ছিল না। মীরবাজার আমাদের বাঙলো থেকে প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ। প্রতাপবাবুর বাড়ী এই মীরবাজারে। তাঁর বাড়ীর সামনে অনেকটা খোলা মাঠ; মাঝখানে একটা বড় পেয়ারা গাছ বেশ সৌখীন ভাবে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়েছিল। এই গাছ তলাটিই ছিল আমাদের 'আড্ডা'। একটা খুব মজবুত ডালে কাছি ঝুলিয়ে একটা দোল্‌না তৈরী করা হয়েছিল—বিকেল বেলা সেইখানে বসে দোল খাওয়া ছিল আমাদের খেলা।

কুমার প্রতাপবাবুর ছেলে, আমার বয়সী। এ সব অনেক-দিনের কথা; তখন আমরা স্কুলে পড়তুম, বয়স নয় কি দশ। যে দিনকার একটা কথা বলছি তখন রমা এসেছিল। রমা কুমারের পিস্তুত-বোন্—কিছুদিন আগে তারা এসেছিল। তার ডাক-নাম রমা, ভাল নাম ছিল মনোরমা। তার সঙ্গে আলাপ হ'তে সাত আটদিনের ভেতরেই সে আমাকে নিজের লোক ক'রে

নিয়ে 'রেণুদা' ব'লে ডাক্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছিল। আমার ভাই বোন্ কেউ ছিল না, তাকে বোধ হয় সে স্থানে পেয়ে নিজের বোনের মত দেখেছিলুম—কিন্তু সেই কথাই আজ বল্‌তে হ'বে। রমা তখন ছয় বছরের।

সে দিন বিকালবেলা কুমারদের বাড়ী যেতেই রমা এসে টানাটানি—"রেণুদা শিউলী গাছটা একটু নাড়া দেবে চলো না।" তার কথায় 'না' বল্‌বার জো ছিল না, আর গাছটা নাড়া দেওয়া বৈত নয়। গাছে উঠে ওপরের ডাল দু একটা খুব জোরে নাড়া দিয়ে নেমে এসে তাকে ফুল কুড়িয়ে দিচ্ছি এমন সময় কুমার এসে ডাক্‌লে। রমাকে বল্লুম, "এবার তুমি কুড়োও ভাই, আর ত বেশী নেই; কেমন?" রমা গুন্ গুন্ ক'রে গান করতে করতে 'হুঁ' ব'লে ফুল কুড়োতে লাগ্‌ল, আর রেণুবাবু একলাফে দোলায় উঠে হুকুম দিলেন—

"দোল দে কুমার—খুব জোরে।"

কুমার খুব জোরে দোল দিতে পারে না। নেমে প'ড়ে বল্লুম তাকে—"দেখ্ কেমন ক'রে দোল দিতে হয়।"

দোল ত খুব জোরেই দেওয়া হল। রমা ফুলের চুবড়ীটা নিয়ে তখন রোয়াকে বসে মালা গাঁথ্‌তে আরম্ভ করেছে; যখন দোলায় উঠে খুব জোরে দুল্‌ছি, রমা কোনদিকে না চেয়ে বল্লে—"বেশী জোরে দুলনা রেণুদা; যদি দড়ি ছিঁড়ে যায়!"

কুমার বল্লে—"হ্যাঁ, এ দড়ি আর ছিঁড়তে হয় না; এ দড়িতে জগন্নাথের রথ টানা যায়—জানিস্ বোকা!"

কে অবোধ, কে সুবোধ তার পরিচয় পেলুম পরে, যখন একবার দড়ি ছিঁড়ে গেল, আর ছিট্‌কে গিয়ে দশ হাত তফাতে মুখ থুবড়ে পড়লুম—হাতেও লেগেছিল বেশ।

রমা হাসেনি—আমি প'ড়ে যেতেই সে ছুটে গিয়ে তার মাকে ডেকে আন্‌লে; আর কুমার হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। অজ্ঞান হ'য়ে যাইনি একেবারে, কিন্তু বিশেষ সজ্ঞানেও ছিলুম না। রমার মা কোলে ক'রে বাড়ী নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে হাওয়া করছিলেন; তার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গতে বুঝলুম—রাত্রে এঁরা বাড়ী যেতে দেননি। ঘুম ভাঙ্গতে বড় তেষ্টা পেয়েছিল, তখন ঘরে কেউ ছিলনা; একটু পরেই রমা এল—সেই জল এনে দিলে। উঠে বসে দেখি রমার আগাঁথা শিউলী ফুলের মালা তার বিছানার ওপর প'ড়ে আধশুখনো হ'য়ে।

২

আমার সঙ্গে রমার সেই প্রথম দেখা। বড় বেশী জনে খেলাধুলা ক'রে থাকি ত সে পনের দিন। দোলা থেকে প'ড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা ভেঙ্গে গেছল, সে আর তেমন ক'রে জোড়া লাগেনি। অনেক চেষ্টাতেও সে জোড়া লাগেনি এই পতনস্মৃতিটা বুঝি সজাগ ক'রে রাখ্‌বে ব'লে—আর রমার স্মৃতি কর্ম্মের পথে উজ্জ্বল হ'য়ে থাক্‌বে ব'লে। কি মায়ায়—স্নেহের কি বিচিত্র টানে সে আমায় বেঁধে রেখেছিল জানিনা; মেদনীপুর ছেড়েও তাকে আমি ভুলিনি।

যে দিন মেদনীপুর ছেড়ে চলে আসি, সে দিনটা এখনও মনে পড়ে; সে দিন প্রতাপবাবু আমাদের তুলে দিতে ষ্টেশনে এসেছিলেন, সঙ্গে এসেছিল—কুমার আর রমা। গাড়ী যখন ছেড়ে দিলে, কুমার কাঁদ কাঁদ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল—আর দুটী বড় বড় কালো চোখ নিয়ে এলোমেলো ঘন কোঁকড়া চুলের মাঝখান থেকে বেশ করুণভাবেই চেয়েছিল রমা—এঞ্জিনের গতি অতিক্রম ক'রে তার দৃষ্টি আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছিল।

তারপর কত জায়গা ঘুরেছি; মুনসেফদের এক জায়গায়

বেশীদিন থাকৃতে হয়না—তাই বাবার বদলীর সঙ্গে আমারও বদলী। কিন্তু রমার মত ছোট্ট মেয়ে আর কেউ আমায় 'রেণুদা' ব'লে ডাকেনি—ঠিক তেমনটী তাই—আর কোথাও দেখিনি। দুটী বড় বড় সজল চোখের চাহনি কোথাও পাইনি আর—গাছ নাড়া দিয়ে ফুল পেড়ে দিতেও আর কেউ বলেনি—দোলাতেও সেই শেষ দোলা, তাই 'প'ড়ে যাবে' এ কথা ব'লে সাবধান করারও কারুর দরকার হয়নি।

এ সব আজ পনের বছর আগেকার কথা।

*　　　*　　　*　　　*

নির্ম্মল আমার ছেলেবেলার বন্ধু; খুলনায় তাতে আমাতে অনেকদিন একসঙ্গে পড়েছি। একসঙ্গে 'ম্যাট্রিকুলেশন্' পাশ ক'রে কলেজেতে পড়েছি; তার পর সে ওকালতি পড়তে গেল—আমি গেলুম ডাক্তারীতে।

পাশ ক'রে বেরোনর পর অনেকদিন তার সঙ্গে আমার দেখাশুনা হয়নি। সে ছিল খুলনায়, আমি ছিলুম কল্‌কাতায়। কাজ শুধু ভবঘুরের মত বেড়িয়ে বেড়ান—লক্ষ্যহীন আর লক্ষ্মী-ছাড়া হ'য়ে।

আমরা যখন কলেজে পড়তুম তখন নির্ম্মলকে রমার কথা বলেছিলুম। নির্ম্মল তার গম্ভীর মুখখানা আমার চোখের সামনে তুলে ধ'রে যখন জিজ্ঞাসা কল্লে—

"বাড়ী কোথায় রমাদের ?"

তখন উত্তর দিয়েছিলুম—"জানি না।"

"তার বাবার নাম কি ?"

"কি ক'রে জান্‌ব ?"

"কুমারের কে হয় ?"

"পিস্তুত বোন।"

"এখন তার খবর নে না কেন ?"

"নিয়ে কি হ'বে ?"

"আজ পর্য্যন্ত তার কোন খবর নিস্‌নি ?"

"না।"

"নিবি না ?"

"না।"

"তবে কি এই জীবনটা হাহুতাশ ক'রেই কাটাবি ?"

"কেন, হাহুতাশ কিসের—সে আমার কে রে ?"

"তবু ?"

"তবু আর কি ? তাকে সেই ছ'বছরেরটী দেখেছি ; মাঝে মাঝে মনে হয় তাকে আর একবার দেখি। তার 'রেণুদা'কে সে চিন্‌তে পারে কি না।"

"তাই বল্‌ছি—খবর নিয়ে খুঁজে বার কর না তাকে।"

"না না সে যেমন আছে থাক্‌, ভাল থাক্‌লেই হ'ল।"

"আচ্ছা, তাকে যদি কেউ খুঁজে এনে তোর কাছে দেয় ?"

"বেশ তো দেখ্‌তুম, আর—"

"আর—বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিতিস্‌ যে সস্ত্রীক বাড়ী যাচ্ছি—বরণ-ডালা সাজাও ; কেমন ?"

"ধেৎ খ্যু—আমি না তার রেণুদা; তোর মতি গতি কি হ'ল, লোপ পেয়েছে নাকি?"

"না তা পায় নি; তবে 'আর'টা কি?"

"আর সেই আদুরে বোনটির জন্যে তোর মত একটি বর খুঁজব।"

৩

সে সব দিন কোথায় চলে গেছে। এখন দেশ ছেড়ে কোথায় বম্বে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর হ'য়ে পড়ে আছি। স্বদেশ ছেড়ে আজ কোথায় ভারতবর্ষের এক কোণে কুঁড়ে [illegible] এক রকম দিনগুলো কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়ে আজ দেড় বছর বম্বেতে পড়ে আছি, এর ভেতর বাঙ্গালা দেশে আর যাইনি। পূজার সময়ও বেশী দিন ছুটী পাইনি—কোথায় যাব?

সেদিন নির্ম্মলের চিঠিখানা যখন পিওন এসে দিয়ে গেল তখন বেলা সাড়ে সাতটা। চিঠিটা খুলে এক নিশ্বাসেই পড়ে ফেল্‌লুম। কি যে লিখেছে তা ভাল বুঝতে পারিনি; নির্ম্মল লিখেছে—

"রেণু—মার তাড়াতাড়িতে যে ভুল ক'রে ফেলেছি, তা শোধরান বড় শক্ত; হিন্দুর ঘরে এ ভুল শোধরান যায় না। তুমি শীঘ্র একবার খুলনায় এসো; তুমি এলে তোমার কাছে আমায় ক্ষমা চাইতে হ'বে। তোমার অগাধ ভালবাসা আমার সমস্ত ত্রুটী এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তার শীতলচ্ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে ফেলবে তা জানি। তোমার আশায় রইলুম। সবাই ভাল আছি। ইতি—কুশলপ্রার্থী—নির্ম্মল।"

সেপাই-ঝোরা

একটা অব্যক্ত, কি একটা অবোধ্য বেদনার স্পর্শ সারা মনখানি জুড়ে. জিনিষপত্রগুলো শীঘ্র ক'রে গুছিয়ে ফেলবার জন্যে জেদ্ ধ'রে বস্‌ল।

দশ দিনের ছুটী যে কি ক'রে সংগ্রহ করেছিলুম তা আর বলবার নয়। সেই দিনই রওনা হ'য়ে পড়লুম। ঠিক মন যেমন ছুটে চলেছে তার স্নেহের টানে—প্রেমের ডানা মেলে, তেমন ক'রে ছুটে চ... ...মন শক্তি এঞ্জিনের না থাক্‌লেও প্রাণপণ ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটেছিল, হুস হুস ক'রে।

হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে ছুটলুম শিয়ালদায়। কিন্তু রাত্রি দশটার সময় ছাড়ল গাড়ী এক রকম অস্থির ক'রে আমাকে। ভোরের বেলা ভৈরবের পারে খুলনা ষ্টেশনে গিয়ে পৌছুলুম, ভাবনার একটানা স্রোতের মাঝে ভাস্‌তে ভাস্‌তে।

ছেলেবেলায় যে সব পথে কত ছুটাছুটি ক'রেছি সেই সব পথ দিয়ে, কত শৈশব-স্মৃতির ভেতর দিয়ে যখন পৌছুলুম, তখন নির্ম্মল সদরে বসেছিল। আমাকে দেখেই সে বেরিয়ে এসে কুলির মাথা থেকে মোট দুটো নামিয়ে নিয়ে, তাকে বিদায় ক'রে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াল। হাত দুটো চেপে ধ'রে বল্লে—"বড় কষ্ট দিয়েছি নয়? তুই আসবি তা আমি জান্‌তুম।"

"কিন্তু কি ব্যাপার আগে বল দেখি।"

"সে বল্‌ছি—কিন্তু আমিও যে জড়িয়ে পড়ব তা জান্‌তুম না ভাই।"

"কি হয়েছে তাই বলনা আগে।"

নির্ম্মলের মা এসে বল্লেন—"আয় বাবা, ভেতরে চল, কেমন আছিস?"

"ভাল"—ব'লে তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় ক'রে নিয়ে কোন-রকমে সিঁড়ি ক'টা পার হ'য়ে নির্ম্মলের ঘরে গিয়ে বসে পড়লুম জামা জুতা খুলে।

৪

রমা এসে যখন সামনে দাঁড়াল, তখন চমকে উঠিনি এমন নয়, কিন্তু সামলে নিয়েছিলুম। লতার মত শান্ত দেহখানি, সেই বড় বড় কালো চোখ দুটো মুখের পানে তু'লে ধ'রে বল্লে—"কেমন আছ রেণুদা ? এতদিন কোথা ছিলে ?"

"ভাল আছি ত। আমি বোম্বায়েই ছিলুম সেখান থেকেই আসছি।"

"কিন্তু বোম্বাইয়ে ত মোটে দেড় বছর ছিলে শুন্‌লুম, তার আগে ?—তোমার হাত একেবারে ভাল হ'য়ে গেছে রেণুদা ?"

অনেক দিনের কথা আজ সে জাগিয়ে তুল্লে। কোথায় কোন্ কোণে মনের ভেতর কত স্মৃতির আড়ালে ঘোর আঁধারে সে পুরাণ কথা শিথিল বসনে ঘুমিয়েছিল, আজ তাকে জাগিয়ে তুল্লে রমা, তার দুটো কথায়। ধীরস্বরে ব'লে গেলুম—"একেবারে ভাল হয়নি।"

রমার পানে চেয়ে দেখি তার বড় বড় কাল চোখ বেয়ে মুক্তাফলের মত দু'ফোঁটা অশ্রু কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে উতলা হ'য়ে উঠেছে। আড়াল দেওয়ার শত চেষ্টাতেও তার লুকিয়ে কাঁদা আমার কাছে ধরা দিয়েছিল।

সেই ছয় বছরের রমা হ'লে কোলে ক'রে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতুম, বলতুম কেঁদ না। এখনও সে বাসনা প্রবল হ'য়ে উঠে তাকে বুকে চেপে ধ'রে বলতে চেয়েছিল,—কেঁদ না। কিন্তু এখন সে আমার স্পর্শের বাহিরে। আমার অনুভূতির বাহিরেও বুঝি! সে আমার বোন—হউক সে আমার বোন—কিন্তু সে যে তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহের দাবী শক্ত বাঁধনে বেঁধে সোহাগের বাঁধন শিথিল ক'রে তুলেছে—বোন হ'লেও সে নারীমর্য্যাদার দাবীদার!

* * * *

অনেক কষ্টে নির্ম্মল তার হাতখানা দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধ'রে বল্লে—"কিন্তু এমন কেন হ'ল ভাই? আমি যে কত বড় অবিচার তোর ওপর—"

"কিসের অবিচার? মনে নেই গাছতলায় বসে—সেই কলেজের মাঠে, সেদিনকার কথা?"

"আছে।"

"তবে?"

"কি

"এর ভেতর আর কিন্তু কি? মনে নেই বলেছিলি—আচ্ছা রমাকে যদি কেউ তোর কাছে এনে দেয়;—আর তার উত্তর কি দিয়েছিলুম? তার মুখের রেণুদা ডাক ত আজ শুনেছি: আর তোর মতই একটা বর খুঁজব বলেছিলুম, সে আর আমাকে খুঁজতে হ'ল না, ভগবান খুঁজে দিয়েছেন; আর আমার সঙ্গে

রমার স্নেহের সম্বন্ধ বেশ পাকা ক'রে গড়ে তুলেছেন। বেঁচে থাক ভাই তোমরা দুজনে—এই প্রার্থনাই আমি তাঁর কাছে করছি।"

নির্ম্মল নির্ব্বাক। আবার বল্লুম—

"যাক্—বিয়ের সময় কিন্তু কেন খবর দিলি না?"

"বলছি—কিন্তু মা যদি সে সময় মত না দিতেন।"

"কেন বার বার সে কথা বলছিস—তিনি মা তাঁর—শুধু কি হয়েছিল তাই বল।"

"দেখ্ তোরও বোধ হয় নিতাই বাবুকে মনে পড়ে। তোদের বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী। আমরাও বাহিরে বাহিরে কাটিয়েছি—জান্তুম না রমা নিতাই বাবুরই ঐ একটি মেয়ে। তিনি প্র্যাক্‌টিশ করতে পাননি বেশীদিন, যক্ষ্মাতেই তাঁর খুব শীঘ্র শেষ হয়েছিল, তিনি ত অল্প বয়সেই মারা গেছেন। কিন্তু এ সব জেনে শুনেই মা মত দিয়েছিলেন ভাই——

"বিধবার মেয়ের পনেরো ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে হয়নি—তা শুধু টাকার অভাবেই নয় ভাই; নিতাই বাবু যক্ষ্মাকাশে ভুগে মারা গেছেন ব'লে কেউই সাহস ক'রে ওখানে বিয়ে করেনি। সেদিনকার কথা বলি—বনগাঁর ভূধর বাবু তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে, বিয়ের রাত্রে বর নিয়ে রাগারাগি ক'রে চলে যান। দেশের লোক ভাল করতে পারে না, মন্দই ক'রে থাকে। যাঁদের দ্বারা এতদিন বিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিল তাঁদের দ্বারাই এ বিয়েতে গণ্ডগোল উপস্থিত হ'ল। ভূধর বাবু ব্যারামের

কথার উত্থাপন না ক'রে দেনাপাওনা নিয়ে একটা হৈ চৈ তুলে ঝগড়া ক'রে চলে যান; আর মেয়ের মা! বিধবা কান্নাকাটি ক'রে বললেন আমাদের—'বাবা যেমন ক'রে হোক্ আজই রমার বিয়ে দে তোরা, জাত যায় যে!'—

"যিনি গ্রামের কেন পাড়ার পড়শী, মায়ের মতন তাঁর—সে বিধবার কান্না এসে বুকে ধাক্কা দিলে ভাই; ঘোর কাটিয়ে দিয়ে ঝটকা বয়ে ব'লে গেল—তোরা লেখাপড়া শেখা ছেলে বাবা, তোরা গ্রামের পাঁচজনের একজন, তোরা থাকতে জাতি যাবে বাবা? জানি না মনের কোথায় গিয়ে বাজল ভাই, প্রাণের কোথায় ঘা দিলে। মাকে এসে পায়ে ধ'রে বল্লুম, 'মা'—

"মা বল্লেন, 'এখনি বাবা, সমাজের গৌরব তোরা, বংশের উজ্জল বাতি; যা বাবা গ্রামের আলোকরা ধন, যা রমার মাকে উদ্ধার ক'রে আয়।'—

"মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় ক'রে নিয়ে নিজেই 'বর' সেজে গেলুম। মা তাঁদের অন্দরে গিয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে আনলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমি কিছুই জানতুম না, বা কোন কথা শুনিও নি। এখন যে ভাই তোর সেই ছয় বছরের রমা আজ ষোল বছরের হ'য়ে আমার ঘরে। তুই আমার চেয়ে তুই বছরের ছোট কিন্তু আজ থেকে আমিই তোর ছোট ভাই!—

"আজ মনে হয় হিন্দুর সমাজ কি অবনতির ধাপে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শত অনাচার অকল্যাণের ডালা মাথায় নিয়ে। গ্রামের লোক দেখে শুনে পাঁচ কথা কয় তখন, যখন সময়ে মেয়ের

বিয়ে দেওয়া হয় না ; বড় মেয়ে হ'য়ে গেল ; বিদেশী ফ্যাসান ; ওকে জাতিচ্যুত কর, একঘরে কর। অপর দিকে বিয়ে না হওয়ার মূলে কিন্তু তারাই। তারাই পেছু ফিরে বর বিয়ে করতে এলে তাকে বলে 'ওহে, ঠকাচ্চে ফিরে যাও!' গ্রামের লোক এমনি ক'রে সাহায্য ক'রে চলেছে, হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে আর হিন্দুত্বের আড়ালে দাঁড়িয়ে শত অনাচারের মাঝখানে। হিন্দু-ত্বের 'একেলে' ধর্ম্ম কর্ম্ম এই রকম।—

"যাক্ ভাই! আমার এ বিষয়ে তোমায় বল্‌বার অবসর ছিল না ; ক'মিনিটের কথায় বিয়ে স্থির হয়েছে তা হিসেব ক'রে নাও ; কিন্তু এ বিয়ের অন্তরে যে কি একটা মস্ত-ভুলের স্পর্শ অনু-ভব করছি, আমি তা বলতে পারছি না। আমাকে মাপ কর্ ভাই, বল—ক্ষমা করেছি।"

* * * *

৮

তখন বোম্বায়ের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজে আড়াই শত টাকা মাইনেয় ভর্ত্তি হ'য়ে বেশ নির্ব্বিকারে দিন কাটিয়ে যাচ্ছিলুম। চাকুরী পাকা হ'লে বেশ দশ পনের টাকা ক'রে মাইনেও বেড়ে যাচ্ছিল। লক্ষ্ণৌএ যাবার প্রায় দেড় বছর পরে খবর পেলুম নির্ম্মলের কিছুদিন হ'ল একটী ছেলে হয়েছে কিন্তু রমার শরীর ভাল নেই; তখন যাবার ইচ্ছা থাকলেও খুলনায় যাওয়া ঘটেনি। এমনি ক'রে একা বিদেশীদের মাঝখানে দিনগুলি কাটিয়ে চলেছি সেই দারুণ গরম দেশে লক্ষ্ণৌএ। আর যখন রমার কথা মনে পড়ত তখন তার ছেলেটিকে দেখবার জন্যে প্রাণ আকুল-ব্যাকুল হ'য়ে উঠত। আর তার সঙ্গে মনে পড়ত নির্ম্মলের মাকে সেই নারীরূপিণী দেবীকে—তাঁর ডালাভরা আশীর্ব্বাদ—“যাও বাবা বিয়ে ক'রে এসো, সমাজের উজ্জ্বল বাতি আলোকরা ধন!”

নির্ম্মল সব চিঠিতেই প্রায় লিখেছে—রমার শরীর মোটেই ভাল থাকছে না; খোকা হ'য়ে থেকে সে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের লক্ষ্ণৌএ আসবার জন্যে অনেক জেদ করেছি। যাচ্ছি যাব ক'রে তারা মাঝে দুটো শীত কাটিয়ে দিলে।

সেপাই-ঝোরা

ঠিক রমারই মত দেখতে সেই আড়াই বছরের খোকাটিকে নিয়ে রমা, নির্ম্মল আর তার মা এসে পৌঁছলেন আমার ছোট্ট বাসাবাড়ীতে। রমাকে আর দেখলেই চিনতে পারা যায় না, তার সেই লতার মত চেহারা যেন কিসের ঝাঁঝে ঝল্‌সে গেছে, সেই চোখের ভাসা জ্যোতি অস্পষ্ট হ'য়ে পড়েছে, মুখের হাসি ঠোঁটে মিলিয়ে আছে, যেন কি একটা অভাবে সে আজ শ্রীহীন! গাড়ী থেকে নেমে টপ ক'রে একটা প্রণাম ক'রে বল্‌লে, "রেণুদা, এবার ত পেয়াদা এসেছে টানাটানি ক'রে নিয়ে যেতে; ছাড়বে না ত এবারে।"

একটা শুষ্ক হাসি হেসে তার কোল থেকে খোকাকে নিয়ে ভেতরে গেলুম। নূতন অচেনা মানুষটিকে দেখে একটুও কাঁদেনি খোকা। বেশ স্থির হ'য়েই ছিল।

তখন কিন্তু বুঝতে পারিনি কিছু। পরে যখন শুনলুম নির্ম্মল তার মাকে পর্য্যন্ত ধ'রে এনেছে আমার ঘর-সংসার পেতে দেবে ব'লে, আর রমা এসেছে তার বৌদিদিকে নিজে হাতে বরণ ক'রে তুল্‌বে ব'লে তখন বুঝলুম যে এরা হাওয়া বদ্‌লাতে মোটেই আসেনি।

নির্ম্মলের ছেলের নাম সুদীন; আড়াই বছরের ছেলে একটী কথকঠাকুর। তিন দিনে সে তার রেণুমামার কাঁধটার ওপর ইজারা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে যখন সারা বিশ্বসংসারের খবর চেয়ে বস্‌ল তখন তার কথার জবাব দিতে গিয়ে একটা বিশ্বকোষের প্রয়োজন বোধ হ'লেও তা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব। এই

রকম ক'রে সাতদিন কাটাবার পর নির্ম্মল একদিন দিব্য বর সাজিয়ে কাছেই হরচাঁদপুর থেকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলো। তখন আমার বলতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্বর্গ থেকেই আশীর্ব্বাদ করেছিলেন আর নির্ম্মলের মা ছিলেন ডালাভরা মঙ্গল কামনা নিয়ে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে! বিয়ে ক'রে এসে দাঁড়ালুম, রমা বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌লে 'বরকনে', কত হাসির ঢেউ তুলে তার সজল চোখদুটী আড়াল দেবার জন্যে।

কোথা থেকে সুদীন এক গা ধুলা মেখে এসে হাত দুটো টানতে টানতে বল্‌লে—"ও কে লেণুমামা ?"

* * * *

নিজের গলার হার খুলে রমা নূতন 'বৌ'এর গলায় পরিয়ে তার বিয়ের বেনারসী জোড় নূতন 'বৌ'কে পরিয়ে ঝুপ ক'রে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে গেল ; যাবার সময় ব'লে গেল, "আসি রেণুদা এই পূজোর ছুটিতে 'বৌ'কে নিয়ে বাড়ী যেও, যাওয়া চাইই কিন্তু ভুল্‌বে না ?"

কেন জানি না দু'ফোঁটা জল চোখ বেয়ে প'ড়ে গেল, বল্‌লুম, "আয় বোন এখন ; কিন্তু পূজোরও এখন ঢের দেরী।"

৬
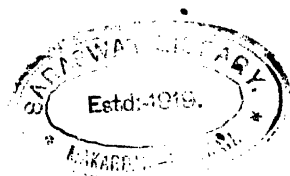
শীত চলে গেল রমাদের খুলনা যাওয়ার সঙ্গেই। তার পর দীর্ঘ আটমাস কাল পূজার আশে কাটিয়েছি। দেখতে দেখতে পূজোর ছুটি এল প্রবাসীদের ভেতর বেশ একটু সাড়া দিয়ে।

যখন খুলনা গিয়ে পৌঁছুলুম তখন নির্ম্মলদের বাড়ী ঢুকতে কেমন একটা স্বস্তির স্পর্শ এসে সারা বুকখানা জুড়ে বসল। খোকা সদরে ছিল ছুটে এসে সে হাতদুটো আমার টানতে টানতে নিয়ে গেল—"মামা এচেছে।"

তিনমাস হ'ল রমা সবাইকে ফেলে কাঁদিয়ে কোথায় কোন্ অজানা পথের পথিক। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নির্ম্মল ব'লে গেল—"খবর দিইনি তোকে যা আমি কোন রকমে ভুলে আছি তা সাম্‌লাতে, কি ভুলতে তুই পারতিস না; আর সে ত যাবেই ভাই, এ রোগে ক'টা লোক বাঁচে? কিন্তু যেমন ফাঁকি দিয়ে আমি তাকে ঘরে এনেছিলুম তেমনি ফাঁকি দিয়েই সে চলে গেছে। আর যাবার আগে জান্‌তে চেয়েছিল শুধু—রেণুদা এসেছে?"

যে ক'টাদিন ছিলুম খুলনায়, সে ক'টাদিন কাটিয়েছি শুধু সুদীনকে নিয়ে। এমন ক'রে আপনার আর কেউ কোনদিন হ'তে বুঝি পারেনি আমার। যেখানেই থাকি খুঁজে সে বার করত তার 'রেণুমামাকে'। সারাদিনটা কাটাত সুদীন আমারই

কাছে। থাক্‌তে পারতুম না আমিও তাকে ছেড়ে বেশীক্ষণ। ছুটে গিয়ে খবর নিতুম কোথায় আছে সে, মুহূর্ত্ত যদি দৃষ্টির বাহিরে থাক্‌ত সুদীন। জান্‌ত না সে তার মা কোথায়, কি তার ঘটে গেছে এই শিশুবয়সে। আমারই গলায় ছোট্ট গোল গোল হাত দুটী তার জড়িয়ে ধ'রে বলেছে কতদিন "মামা মা কোথায় ?" কতদিন চীৎকার ক'রে কেঁদে কত বায়না করেছে, বলেছে— "তুমি চলে যেওনা লেণুমামা।"

যাই যাই ক'রে কতদিন থেকে গেলুম সুদীনের কাছে। কিন্তু আর ত থাকা চলে না। শেষে একদিন চুপে চুপে লুকিয়ে তাকে চলে গেলুম। চলে গেলুম সুদীনকে লুকিয়ে, ছেড়ে তার মধুর শান্ত সঙ্গ, আর সাথে নিয়ে একেবারে হাল্‌কা একটা সকে তাকে ফেলে-যাওয়ার অবসাদ মাথা বেদনাটুকু, একটা কি যাতনা, কী একটা অতৃপ্ত বাসনা !

*　　*　　*　　*

সুদীনকে লুকিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে এসে ভাল কাজ করিনি। তার মুখ রমার, রমার মুখ তার ! সুদীনের মুখে রমার ছায়া স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছিল—রমারই প্রতিবিম্ব মাত্র। রমা নেই, কিন্তু সুদীন আছে। তাকে দেখে রমার সব স্মৃতি জমাট হ'য়ে থাকে মনের কোণে। কিন্তু তাকে লুকিয়ে আসা ভাল হয়নি। আসবার সময় কাঁদ্‌বে জানি কিন্তু লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি, ঘুম থেকে উঠে যখন সে কাঁদবে ? ডাক্‌বে—"লেণুমামা—মা !"

৭

আবার সেই পূজার আশা—বাড়ী যাব, কিন্তু কেন!
তখনও পূজার বন্ধ হ'তে প্রায় এক সপ্তাহ দেরী। আশা এই পূজায় গিয়ে নির্ম্মলকে দেখে আসব আর সুদীনকে নিয়ে আসব। কিন্তু সব আশাই অন্যরকম হ'য়ে দাঁড়াল পথের মাঝে যখন নির্ম্মলের টেলিগ্রাম পেলুম শীঘ্র বাড়ী যাবার জন্য।

ছুটি সে কয়দিন পেলুম না; কর্ত্তারা হুকুম দিলেন এ সাতটা দিন পরে যাবেন অর্থাৎ পূজোর বন্ধে, না হ'লে চাকুরী যাবে। তখন মাইনে পেতুম একগাদা টাকা, খাতির—দুদিন ছুটি চাইলে চাকুরী যাবে। যত বড় কর্ম্মচারিই হই তবু চাকর, চাকুরী যাবে মন না যোগালে—চাকুরীর এই ব্যবস্থা!

তাই যাক্! এ ডাক যে অন্তর থেকে, এ নির্ম্মলের একলার নয়। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নির্ম্মলের কাছে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লুম। শিয়ালদায় কুমারের সঙ্গে দেখা হ'ল অনেকদিন পরে। সে কেঁদে ফেললে, বললে—"রমার শেষ স্মৃতিও বুঝি যায় ভাই। তার বড় ব্যারাম।"

শিয়রে গিয়ে বসতে খোকা লাফিয়ে উঠে ডাকলে—"মামা।" সাড়া দিলুম—"এই যে আমি এসেছি।"

"তুমি ত নয়, ছে লুকিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে গেছ যে।"

*　　*　　*　　*

জানি না কি ব্যথাই তাকে দিয়েছি ঘুমন্ত রেখে চলে গিয়ে। কত অভিমান সুদীনের সেই ছোট্ট প্রাণটীতে ভ'রে উঠেছিল তাকে না জানিয়ে চলে যাওয়ায়। যাতনার কি নিদারুণ অনুভূতি তার কোমল মর্ম্মমাঝে গাঁথা ছিল যার শাস্তি সে এমনি ক'রে দিয়ে গেল আমাকে! সুদীন—ছেড়ে তাকে থাকতে যে পারিনি আমিও! যখনই অবসর পেয়েছি ছুটে যে তারই কাছে এসেছি। কিন্তু তার অপেক্ষা সইল না—অবসর মত আসা যাওয়ার প্রত্যাশা করে না সে; তাই বুঝি কাঁদিয়ে চলে গেল আমাদের সবাইকে! কিন্তু বুক জোড়া বেদনা সারা জীবন ধ'রে ব'য়ে বেড়াতে রইলুম প'ড়ে বোধ হয় একা আমি। আমি, নির্ম্মল আর কুমার তিনজনে রমার শেষ স্মৃতি, তার শেষ ছায়াকণা, তারই রক্তপুতলী বক্ষে ক'রে তার শেষ দাবী পূরণ ক'রে এলুম— ভৈরবীর ভৈরব তীরে—কোথায় শ্মশানের এককোণে ধূলিমুষ্টির আবরণে তার শ্রান্ত ছোট্ট অবশ দেহখানি জন্মের মত ভাসিয়ে দিয়ে!

*　　*　　*　　*

ফিরে আসতে শুনতে পাই কে বলছে—"**রেণুদা' আসি**" আর পর মুহূর্ত্তে শুনি কে ডাকছে—"**লেণুমামা!**"

ব্যথা

অভিমানিনী সে, বড় আদরে প্রতিপালিতা। আজ সে মাতা-পিতৃহীনা, কিন্তু একদিন তার সব ছিল। ভাল ছেলে দেখে তাঁরা আদরের উর্ষাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন রমেশের সাথে। কিন্তু এমনটী হ'বে, আশাও করেনি কেউ। দিনে দিনে তিল তিল ক'রে আদরিনী উষা তার সব সুখের কথাই ভুলে যেতে চেষ্টা করলে। তার যখন ছিল সরাই আদরও তার পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল; স্বামী-সোহাগেও বঞ্চিত সে কোনদিন হয়নি। কিন্তু সে বড় অল্পদিন। সেই অল্প কিছুদিনের সুখ-ঐশ্বর্য্যের কথাই তার স্মৃতিটুকুকে সজাগ ক'রে তুলতে চেষ্টা করত। এমনি ক'রেই সে আজ সব হারিয়ে নিঃস্ব। তার বল্‌তে আর কিছু নেই। জীবনের সবটুকুই এখন তার গভীর অন্ধকারে মগ্ন। কবে কি ভাবে তার ক্ষুদ্র সুখের জীবনটুকুতে যবনিকা প'ড়ে দিনগুলো যে কি তিমিরে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে কেউ জানেনা। কত আর কাঁদবে, কত কেঁদেছে ত! কেঁদে কেঁদে চোখের সব জলটুকু বুঝি শেষ হ'য়ে গেছে। মরুভূমির মত শুষ্ক প্রাণটাকে বহে বেড়াতে সে যেন আর পারেনা।

লেখাপড়া শিখে রমেশ যে এমনি ভাবেই শেষকালটা

উৎসন্ন যাবে কেউ তা আশা করেনি—উষা ত নয়ই! উষাকে যে রমেশ বড় ভালবাসত। তাদের যখন বিয়ে হয় রমেশ তখন বি, এ পাশ ক'রে স্কুলমাষ্টারী করত। গরীবের ছেলে হ'লেও ভাল ছেলে সে ছিল ও চিরদিন থাক্‌বে এ আশা উষার একার ছিলনা, ছিল বুঝি সকলেরই। কিন্তু হ'ল ঠিক বিপরীত বললেও হয়। চিরদিন ত কারুর কাট্‌বেনা সমান—জীবনটা নিজের হ'লেও দেওয়া যাঁর, তাঁর পরীক্ষা চলছেই সেটাকে চালান নিয়ে। রমেশ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি।

চাঁপদানীর কলে বড় বাবু হ'য়ে বসার কিছুদিন পরেই রমেশ পয়সাগুলো কেমন ক'রে শীঘ্র জলে বা স্থলে ছড়িয়ে ফেলা যায় সে উপায় বেশ ক'রে শিখে নিলে। সংসারে তার উষা ছাড়া ছিল না আর কেউ। সুখে দুঃখে তেমন ক'রে আগুলে কোনদিন কেউ বেড়ায়নি রমেশকে। আজ সে তাও বুঝলেনা কিন্তু। বুঝলেনা রমেশ স্ত্রী তার কি—কি ক'রে তার জীবনের সব আলোটাই ধীরে ধীরে উষা এনে দিয়েছিল! একটু একটু ক'রে মনুষ্যত্বটুকু সবটা হারিয়ে রমেশ যখন বেশ উঁচুদরের মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন কলের অন্য চাকুরে বাবুরা একটুও আশ্চর্য্য না হ'লেও গ্রামের সবাই বড় আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। বড় দুঃখ পেলে শুনে সে কথা উষার দাদা ধীরেন, আর ভেবে তার স্নেহের অনুজা উষার জীবনের পরের পর্য্যায়টুকু।

উষার স্নিগ্ধ আলোর মতই যে উষা একদিন সীমন্তে সিন্দুর নিয়ে বড় মধুর হেসেছিল তার মুখের সে হাসিও উষার ক্ষণিক

হাসি-আলোর মতই অলক্ষ্যে একদিন মিলিয়ে গেল। ডাগর চোখদুটী তার আর সলাজ নেই, সজল হ'য়ে উঠেছে স্বামীর ভবিষ্যৎটা কল্পনার চোখে পরিষ্কার ভাবে দেখে নিয়ে।

মাতালের নেশা—সূর্য্যের ঘুরপাকের মত আলো-আঁধার নিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে চলবে ঠিকই। এ নিয়মের ব্যতিক্রম বড় ঘটে না। রমেশও চূড়ান্ত মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল যখন, নেশাখোরের নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে চললো ছুটে সেও। উষাকে তার আর ভাল লাগল না।

স্ত্রীর উপর অত্যাচার করা—সে ত ন্যায্য অধিকার! স্বামী সেটাকে দাবী ব'লে মনে করে। মাতাল গণ্য করে সেটাকে কর্ত্তব্য ব'লে। স্ত্রী পাছে বিপথে যায় এ জন্য কড়া শাসন রাখা তার উপর ত কর্ত্তব্যই! রমেশও এ কর্ত্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত আদৌ হয়নি। লাঞ্ছনা, প্রহার, পদাঘাত এ ত নিত্যকর্ম্ম, চলবেই। কিন্তু তবুও উষা যখন রমেশকে নিষ্কৃতি না দিয়ে তার গৃহ আগুলে রেখে তার স্বামীর 'পদ-যুগল' কামড়েই প'ড়ে রইল, রমেশও প্রমাদ গণে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে।

প্রত্যহ একবার ক'রে তার স্বামীর দর্শন পেত উষা। কত টাকা রমেশ সঞ্চয় করেছিল জানত না সে। চাকুরী তখনও বুঝি ছিল। কিন্তু কেন উষা জানত না একদিন তার সর্ব্বস্ব তাকে পদাঘাতের পর পদাঘাত ক'রে গহনার বাক্সটী পর্য্যন্ত হস্তগত ক'রে ব'লে গেল—

"তবুও আমার ঘর ছাড়বি না রাক্ষসী? তবে তুই না যাস, আমিই চল্লুম।"

ব্যথা

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি উষা তার আরাধ্যের আশায় কাটিয়ে দিয়ে একা একা রইল প'ড়ে, কিন্তু দয়িত তার ফিরে এলনা।

* * * * *
* * * *

স্নেহময় ভাইটীর সংসারে কোন কষ্টই ছিলনা উষার, তবুও সে ভুলতে পারতনা যে স্বামী তাকে ত্যাগ ক'রে কোথায় চলে গেছেন। ধীরেন কত বোঝাত—"কাঁদিসনি উষা, কাঁদিসনি বোন্। তোর অদৃষ্ট ত কেঁদে খণ্ডন করতে পারবিনা দিদি। সেটা মাতাল, তার সংস্পর্শ ত্যাগ করাই তোর কর্ত্তব্য যে।"

কতটুকু বুঝত উষা তার দাদার সান্ত্বনাবাক্যে জানা যেত না, তবে মনে মনে সে কাকে প্রণাম ক'রে অস্ফুট স্বরে বলত—"কিন্তু তিনিই ত আমার স্বামী। তাঁর স্নেহে বঞ্চিত আজ হ'লেও একদিন ত তাঁর সোহাগেই ডুবেছিলুম।" দেবতার দুয়ারে প্রার্থনা ক'রে বলত উষা—"তাঁকে সুমতি দিও ভগবান; যেখানেই থাকেন তিনি, ভাল তাঁকে রেখো ঠাকুর।"

এমনি ভাবেই দিন যেতে যেতে যখন একদিন স্ত্রী তার পীড়িতা হ'য়ে পড়ল, তখন বুঝলে ধীরেন ঠিক এইভাবে তার সংসারটী চল্‌বেনা। পূজার সময় ছুটী নিয়ে স্ত্রীকে ও ভগ্নীকে সঙ্গে ক'রে বায়ু-পরিবর্ত্তনের আশায় চলে গেল তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে।

বৈদ্যনাথে তাদের ছোট্ট একটী বাড়ী ছিল মাঠের মাঝে। ধীরেনের পিতার বড় আদরের বাড়ী ছিল সেটা ছোট হ'লেও।

স্থানটী তাঁর বড় প্রিয়—দেবতানিবাস। এইখানেই এসে ধীরেন তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তন কল্পে বাস করতে সুরু করলে।

দিনের পর দিন গিয়ে স্বাস্থ্যের চূড়ান্ত পরিবর্ত্তন ক'রে একটী শিশু পুত্র প্রসবান্তে একদিন সকল ব্যাধি হ'তে মুক্তি পেয়ে ধীরেনের স্ত্রী চলে গেল তার স্বামীর কোলেই ছেলেটীকে রেখে। ধীরেনের কর্ত্তব্য-জ্ঞান লুপ্ত হ'য়ে এল।

অনেকদিন পরে যখন সে ফিরলে দেশে তখন শুন্‌লে তার আদরের রমেশ তখন কারাগারে। সঠিক খবর কিছুই সে পেলেনা কেন রমেশ জেলে গেছে; এইটুকু শুধু শুনেছিল কলের চাকুরী ত রমেশের বহুদিন পূর্ব্বেই গেছ্‌ল; বেশ মোটারকম কয়েক হাজার টাকা চুরি করার অপরাধে এবং আরও কি কারণে আইন তাকে ন্যায্য সাজা দিয়ে অবরুদ্ধ রেখেছে।

কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের জ্বালাও বোধ হয় এতটা বেদনাদায়ক নয় যতটা বেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিল ধীরেন রমেশের জীবনকথা আর তার উপস্থিত অবস্থার কথা শুনে। পত্নী তার শিশুপুত্র রেখে চলে গেল হৃদয়খানা তার এই অপূর্ণ বয়সে খান খান ক'রে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়ে। তার পর এই শিশু? জীবনের কোন সাধ-আহ্লাদ বুঝি মেটেনি তখনও, সবটাই বোধ হয় অপূর্ণ আছে—আর তারই উপর তার এই অভাগিনী সহোদরা!

স্নেহের উষার অবস্থা ভেবে ভেবে যখন সবটুকুই তার গোলমাল হ'য়ে যেত, মনে পড়ত তখন তার মৃতা স্ত্রীকে—তাদের মিলন-দিনের কথা। তার পর এই নবীন জীবন-কণাটুকু—সেই শিশু পুত্রটী তাদের। দেশের বাড়ীতে ফিরে সারাদিনটা তার কোথা দিয়ে কেটে যেত কেউ জানত না। ধীরেনকে ত পূর্ব্বের ধীরেন ব'লে মনে কারুর হ'তনা আর, তার চিন্তাক্লিষ্ট গাঢ় কাল রেখায় ভরা মুখের আকৃতির পানে চেয়ে।

পাগলের মত চেহারাটা নিয়ে সারাদিন কোথায় কোন্ নির্জ্জন নিরালায় ফিরে ফিরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার ঝোঁকে বাড়ী ফিরে ভাঙ্গা গলায় ডাকত ধীরেন—"উষা বোন্ আমার?"

উষা আঁচলে চোখ মুছে বলত—"দাদা, নিজের পানে চেয়ে না দেখ, এই ছেলেটার পানেও চেয়ে দেখ একবার। কি চেহারা হয়েছে তোমার একবার দেখেছ কি? এমন ক'রে আর কতদিন—"

চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে উষা তার দাদার কোলে ছেলেটাকে এনে ফেলে দিত। কেঁদে উঠত খোকা যখন 'মা' ব'লে, ধীরেন তাড়াতাড়ি উষার কাছে তাকে দিয়ে দিত, বলত—"ও তোর কাছেই থাকে ভাল বোন্। মানুষ করছিস ত তুইই ওকে, তুই না থাকলে কি ওটা বাঁচত!"

বুকের ভেতর জ্বালা উভয়েরই। প্রাণের ভেতরটা হাহা-কার ক'রে উঠ্‌ত ভ্রাতাভগ্নী উভয়েরই? এমনি কান্না, এমনি শৈথিল্য, এমনি মায়া, এমনি স্নেহ নিয়েই তাদের দিনের পর

দিন কেটে গেল। দেখতে দেখতে দীর্ঘ ছয়টী বৎসরও তাদের ভাইবোনের ছোট্ট সংসারটীর উপর ঝড়ের মত ব'য়ে গেল।

আধ-পাগলা ধীরেন তার ছোট ক'রে ছাঁটা চুল-গুলোর উপর তেল চাপড়াতে চাপড়াতে স্নান করতে গেল একদিন। ফিরে এসে বল্লে—"একটু একটু দেবালয় বেড়িয়ে আসা ভাল বোন্। একবার ঘুরে ফিরে আসি।"

উষার কত কাকুতিমিনতি পাগলকে থামিয়ে রাখতে পারলেনা। সে কেঁদে ভাসিয়ে দেবার পূর্ব্বেই দাদা তার কোথায় চলে গেল। প্রায়ই সে এদিক ওদিক বেড়িয়ে ফিরত, হয়ত সারাদিনটা পরেও, কিন্তু সাঁঝের প্রদীপ গ্রামের পথ আলো করার পূর্ব্বে গৃহে ধীরেন বরাবরই ফিরেছে।

সাতটী দিন কত কান্না কেঁদে ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে বুকে নিয়ে উষা ঘুমিয়ে পড়ত অবশ নির্জীব দেহটা নিয়ে। কোনদিন শ্রান্ত দেহে ভূমিতে লুটিয়ে প'ড়ে তার স্বামীর জন্য কেঁদেছে। দেবতার চরণে ভিক্ষা করেছে—"স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও ঠাকুর; সুমতি দিও তাঁকে।" কতদিন তুলসী-তলায় প্রদীপটী জ্বেলে দিয়ে হাতদু'টী জোড় ক'রে গলবস্ত্রে ভিক্ষা চেয়েছে—"দাদাকে ফিরিয়ে আন ঠাকুর, সুস্থ তাঁকে রেখো।"

নয়নের মণি খোকন এই ছয়টা বৎসর তার পিসিমা উষাকেই তার মা ব'লে জানে. প্রথম প্রথম উষা বলত—"আমি যে

তোমার পিসিমা হই সোণা।" কিন্তু এখন আর বলেনা। খোকা যখন মা ব'লে ডাকে, তৃপ্তির আতিশয্যে উষা তাকে বুকে ক'রে গালে চুমা খায়। আরও জোরে চেপে ধ'রে তাকে মনে মনে বলত—"মা তোমার ঐ স্বর্গে, কি পোড়া কপাল নিয়ে জন্মেছিলি তার পেটে!"

তেমনি সময় কোল থেকে মাথা তুলে খোকা আবার ডাকত—'মা'—

* * * * *

বৈদ্যনাথে তাদের যে বাসাতে ধীরেনের স্ত্রী শেষ হাসি হেসেছিল, সেই বাসাতেই চুপটী ক'রে বসে কি ভাবতে ভাবতে উঠে প'ড়ে, রোজকার মতই যখন মন্দিরের পানে চলে গেল ধীরেন তখন তার প্রাণটা বড় ছট্ ফট্ ক'রে উঠল তার স্নেহের ভগ্নী উষার জন্যে; আর মনে পড়ল তার স্ত্রীর রেখে-যাওয়া স্মৃতিটুকু—খোকাকে। মন্দির প্রদক্ষিণ করা আর হ'ল না ধীরেনের। ঊর্দ্ধশ্বাসে সে মন্দির ছেড়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটল—গাড়ীতে যে চেপে বস্‌ল কখন তা সে নিজেও জানতে পারেনি।

রমেশ চীৎকার ক'রে বল্লে—"কে আছে তবে?—কোথায় গেছে ধীরেনদা'—কোথা?"

খোকা বল্লে—"বাবা কোথায় গেছে ত জানিনা, শুধু মা আছে বাড়ীতে;—ডাক্‌ব?"

খোকা কার সঙ্গে কথা কইছে বুঝতে বাকী ছিল না উষার। ধীরে ধীরে সে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গলবস্ত্রে তার স্বামীর চরণে প্রণাম করলে। খোকা বল্লে—"এই ত—এই ত আমাল্ মা; চিনতে পাচ্ছ না? এই যে আমাল্ মা!"

স্থির হ'য়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রমেশ কুটীল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে উষার পানে, শেষে একটা সশব্দ পদাঘাতের পর ঠিক যেমন ভাবে এসেছিল জেল থেকে খালাস পেয়ে, তেমনি ভাবেই ছুটে পালিয়ে গেল। চীৎকার ক'রে ব'লে গেল—"রাক্ষসী এতদূর! এতদূর এগিয়েছিস! মা হ'তে সাধও গেছ্ল?"

ভয় পেয়ে খোকা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্ল।

*

ধীরেন যখন বাড়ী ফিরে এল তার কান্নামাখা প্রাণখানা নিয়ে, মূর্চ্ছাভঙ্গে তখন উষা রক্তনয়নে দূরের পানে চেয়ে তার স্বামীর উদ্দেশে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। ধীরেনকে দেখেই চেপে ধ'রে ভাইয়ের বুকে নিজের মাথাটী—বল্লে উষা চোখের জলে মিশিয়ে-সব স্বরটাই—"ছেলেটাকে আগে মানুষ হ'তে দাও দাদা। তারপর আমি মরলে তুমি তীর্থে যেও ভাই।"